আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আসলে কী?

আসিফ
নুসরাত জাহান

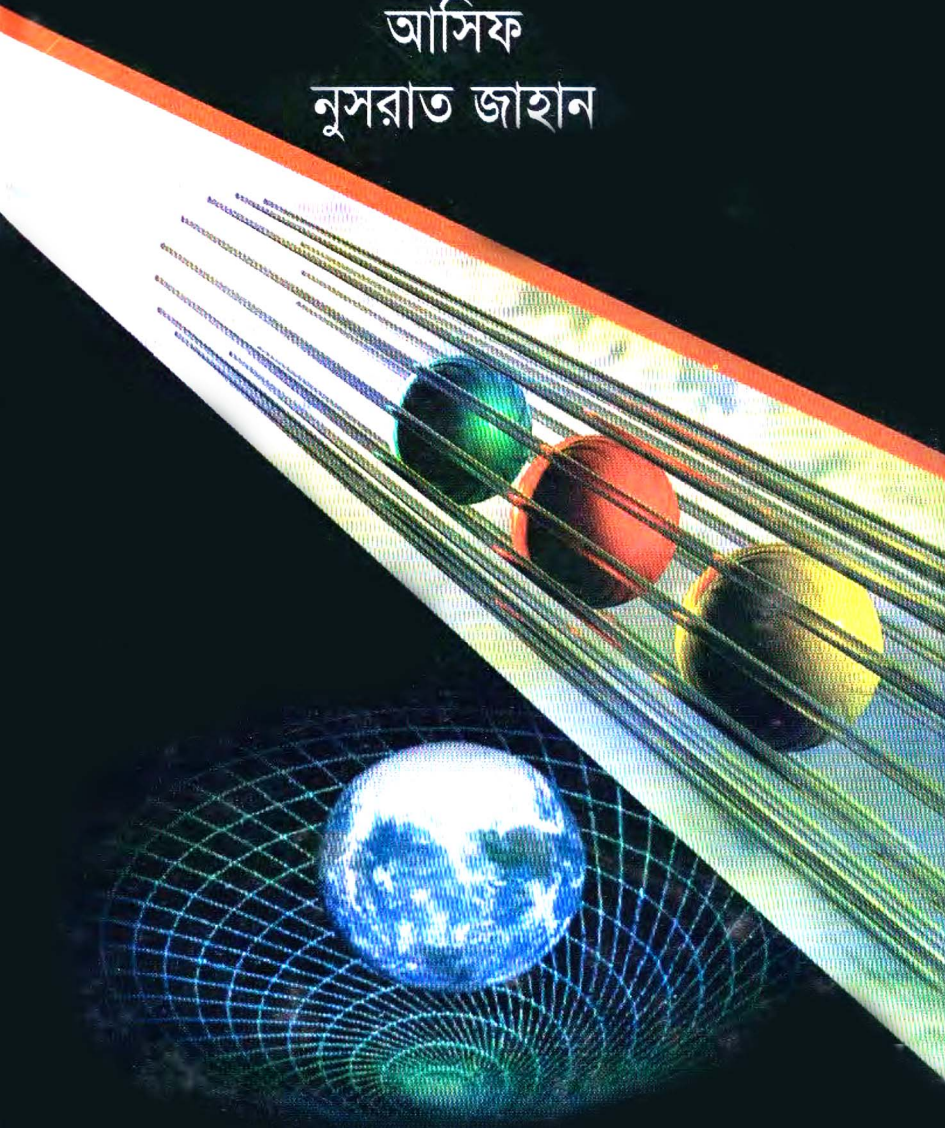

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আসলে কী?

আসিফ
নুসরাত জাহান

সাহিত্য প্রকাশ

প্র চ্ছ দ
অশোক কর্মকার

প্র কা শ কা ল
আশ্বিন ১৪১৮
সেপ্টেম্বর ২০১১

প্র কা শ ক
মফিদুল হক
সাহিত্য প্রকাশ
৮৭ পুরানা পল্টন
ঢাকা ১০০০

মু দ্র ক
কমলা প্রিন্টার্স
৮৭ পুরানা পল্টন
ঢাকা ১০০০

মূল্য : একশত টাকা

ISBN 984-70124-0130-9

উৎসর্গ

আহসান হাবীব

কার্টুনিস্ট ও

উন্মাদ সম্পাদক

সূচি

প্রথম অধ্যায় — ১১

যেসব আপেক্ষিকতায় আমরা অভ্যস্ত

সব জোরালো দাবিরই কি অর্থ থাকে? ভানে না বামে? এখন দিন না রাত? কে বড়? আপেক্ষিকতার পরম হয়ে ওঠা; পরমের আপেক্ষিকে পাল্টে যাওয়া; 'সাধারণ জ্ঞান'ও যাতে আপত্তি জানায়

দ্বিতীয় অধ্যায় — ১৮

স্থান আপেক্ষিক

একটি ও একই জায়গা, নাকি তা নয়?; একটি বস্তু সত্যিকার কীভাবে চলতে পারে; দেখার জন্য সকল বিন্দুই কি সমতুল্য? স্থির অবস্থার চিরবিদায়! জড়-কাঠামো; ট্রেনটি কি চলে? স্থির অবস্থার চিরবিদায়; জড়তার সূত্র; গতিবেগও আপেক্ষিক!

তৃতীয় অধ্যায় — ২৬

আলোর শোকগাথা

আলোর বিস্তার মুহূর্তে বা ঝটপট হয় না; আলোর গতিবেগের পরিবর্তন হওয়া সম্ভব?; আলো এবং শব্দ!; গতির আপেক্ষিকতার নীতি বিভ্রান্তির জালে; মহাশূন্যে ইথার (আলোক তরঙ্গ প্রেরণের মাধ্যম); অবস্থানটি বড়ই হাস্যকর, পরীক্ষণেই নিষ্পত্তি হওয়া উচিত, আপেক্ষিকতত্ত্বের বিজয়; ফুটন্ত কড়াই থেকে উনুনে

চতুর্থ অধ্যায় — ৩৫

আপেক্ষিক সময়

সত্যিই কোনো বৈপরীত্য রয়েছে?; ট্রেনে চড়া; সাধারণ জ্ঞানের বিপরীত?; স্থানের নিয়তিতে সময়ের অংশগ্রহণ; বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা; গতিবেগের নিজস্ব সীমা রয়েছে; আগে এবং পরে

পঞ্চম অধ্যায় — ৪৬

খেয়ালি ঘড়ি এবং মাপকাঠি

আবারো ট্রেনে; স্ববিরোধী ঘড়ি; টাইম মেশিন; নক্ষত্রলোকে যাত্রা; দৈর্ঘ্য সংকোচন; খেয়ালি গতি

ষষ্ঠ অধ্যায় — ৫৮

ভর

ভর বৃদ্ধি; এক গ্রাম আলোর মূল্য কত?

সার-সংক্ষেপ — ৬২

ভূমিকা

পৃথিবী কেন গোল? পৃথিবী ঘুরছে অথচ আমরা পড়ে যাচ্ছি না কেন? এমন হাজারো প্রশ্ন ভিড় করে শিশুদের মনে। কেউ কেউ এর সদুত্তর পায়। কারও-বা এর প্রত্যুৎত্তরে তাচ্ছিল্য জোটে। বড়োদের এত সময় কোথায় ছোটদের অজানা সব প্রশ্নের মুখোমুখি হবার? সদুত্তর পাওয়া ছেলেমেয়েদের মানসিক গঠন আর প্রশ্ন করেও কৌতূহল মেটাতে না পারার মানসিক গঠনের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ফারাক। হয়তো প্রথম দল থেকে বেরিয়ে আসবে ফ্যারাডে, মাদাম কুরি, আইনস্টাইন, কিংবা জগদীশচন্দ্র বসুর উত্তরসূরী। আর দ্বিতীয় দলটি? তাদের কাছে বিজ্ঞান হয়তো-বা থেকে যাবে গভীর রহস্য হয়ে।

শিশু মনে এক সময় যে প্রশ্ন খেলা করতো, তা সময়ের বাঁকে যেন কোথায় হারিয়ে যায়, সময় হয় না সেই হারানো প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার, আবার এমনও হয়তো কেউ আছে যাদের কাজই হচ্ছে হাজারও প্রতিকূলতার মধ্যে থেকেও কৌতূহলী মনের তৃষ্ণা মেটানোর কাজ নিবিষ্ট মনে করে যাওয়া। নিজস্ব জ্ঞানের ভিত শক্ত করে সভ্যতার জন্য নতুন কোনো অবদান রেখে যাওয়া। মানব জন্মে এরচেয়ে মহৎ লক্ষ্য আর কী-বা আছে?

বর্তমানে জ্ঞান অর্জনের উপায় অনেক সহজ। চাইলেই এক নিমিষে সব চোখের সামনে হাজির হয়ে যায়। ফলে বেছে পড়বারও একটা বিষয় এসে পড়ে। বই পড়ার আবেদন কোন ভাবে অগ্রাহ্য করা যাবে না। শিশুদের হাতে তুলে দিতে হবে বই। বই পড়ে হাজারো প্রশ্নের সমাধানের মাঝে খুলে যাবে কল্পনার দুয়ার।

বই পড়ার অভ্যাস মানুষকে ভাবতে শেখায়। পক্ষান্তরে, ইন্টারনেটের দ্রুতগামী ও সহজলভ্য জ্ঞান মানুষের ভাবনা-চিন্তার সময়টুকু কেড়ে নিচ্ছে। ইন্টারনেটে রয়েছে অনেক অনেক সম্ভাবনা, হাজারো জঞ্জাল। একই সাথে সেখানে নষ্ট জালেরও অভাব নেই। চকচকে কোনো গেমস নষ্ট করে দিতে পারে শিশুদের কৌতূহলী মনের একাগ্রতা। বই কিন্তু এই একাগ্রতাকে ধরে রেখে, বিকশিত করে।

আমরা অনেক আশাবাদী, অনেক বার এই সত্য উপলব্ধি করেন বলে এখনও বই মেলায় বা বইয়ের দোকানে ছোটদের উপযোগি বইয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। বই বিক্রি হচ্ছে, যদিও ব্যাপক হারে নয়। তবুও আমরা আশাবাদী এই ভাবানুবাদ গ্রন্থটি কিছু কিশোর-কিশোরীর মনের একনিষ্ঠতা ধরে রাখবে। আপেক্ষিকতার তত্ত্বের মতো আপাত কঠিন বিষয়কে অনেক সরলভাবে এখানে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ডিসকাশন প্রজেক্টও অনেকগুলো বক্তৃতা অনুষ্ঠান করেছে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব অবলম্বনে 'সময়ের প্রহেলিকা' শিরোনামে। সাধারণের কাছে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব বোধগম্যভাবে তুলে ধরার জন্যই এই প্রচেষ্টা। সেরকম প্রচেষ্টা থেকেই এল. লানডাউ এবং ইউ. রুমার-এর What is the Theory of Relativity অবলম্বনে আপেক্ষিকতার তত্ত্ব আসলে কী? ডিসকাশন প্রজেক্ট এর এই ধরনের প্রচেষ্টা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে

আসিফ, নুসরাত জাহান
ডিসকাশন প্রজেক্ট
discussionproject@gmail.com
discussionprojectbd.org

প্রথম অধ্যায়

যেসব আপেক্ষিকতায় আমরা অভ্যস্ত

সব জোরালো দাবিরই কি অর্থ থাকে?

অবশ্যই না। এমনকি আমরা যদি কিছু শব্দ নিয়ে ব্যাকরণের কঠিন নিয়মগুলো অনুসরণ করে সেগুলোকে একসাথে জুড়ে দিই, তারপরও ফলাফল হতে পারে পুরোপুরি নিরর্থক। যেমন—পানি ত্রিকোণাকৃতি; এই বাক্যটিতে ব্যাকরণের নিয়মে কোন ভুল নেই। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে বাক্যটি অর্থহীন।

সব নিরর্থক বাক্য এত সহজে প্রমাণ করা যায় না। প্রায়ই দেখা যায়, প্রথম দৃষ্টিতে বাক্যটিকে সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ বা সঠিক বলে মনে হয়। অথচ খুব খুঁটিয়ে দেখলে বাক্যটির সত্যিকার অর্থহীন দিকটা বেরিয়ে আসে।

ডানে না বাঁয়ে?

রাস্তাটার কোন দিকে বাড়িটি—ডানে না বাঁয়ে? সম্ভবত এই প্রশ্নের উত্তর তুমি ঝটপট দিতে পারবে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, এক হিসেবে দুটি উত্তরই কিন্তু সঠিক। কি বিশ্বাস করবে না জানি। ভাববে, তা হয় কী করে! আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ধরা যাক, তুমি পশ্চিম দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছো। সেক্ষেত্রে তোমার ডানদিকটা হবে উত্তরদিক। আর তুমি যদি পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াও তাহলে তোমার বামদিকটা হবে উত্তরদিক। রাস্তার কোন দিকে বাড়িটি—প্রশ্নের উত্তরের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম খাটে। আসলে ডান-বামদিক নির্ভর করবে তোমার নিজের অবস্থানের উপর। তাই তোমার ডান বা বাম বলার আগে তোমার নিজের অবস্থানটাও উল্লেখ করতে হবে তাহলেই উত্তরটা সঠিক হবে।

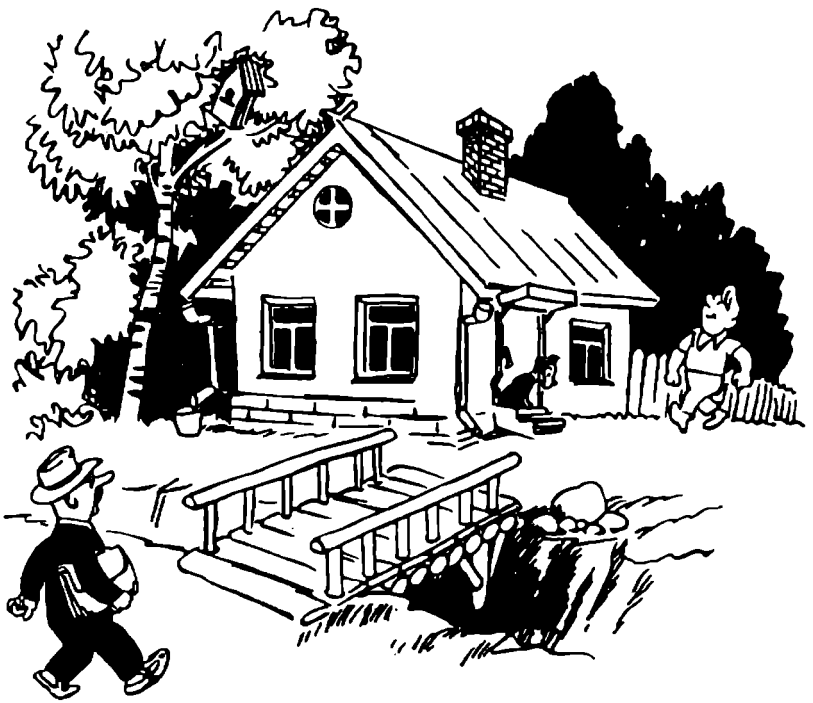

আবার মনে করো, একটা পুল পার হয়ে তুমি বনের দিকে যাচ্ছ। বনটা পড়বে ঠিক তোমার বাঁ দিকে। তুমি অবশ্য উল্টো পথে আসতে চাইলে বনটা তোমার ডান দিকে পড়বে। রাস্তাটার ডান-বাঁ দিক নিয়ে কথা বলতে গেলে তোমাকে অবশ্যই তুলনামূলক বা আপেক্ষিক দিক-নির্দেশনা উল্লেখ করতে হবে

নদীর ডান-বাঁ দিক নিয়ে বলতে গেলে নদীর স্রোতের দিক উল্লেখ করতে হয় কারণ স্রোতের দিকই নদীর গতিপথের নির্দেশনা দিয়ে থাকে। একইভাবে আমরা বলতে পারি যে, একটি মোটরগাড়ি রাস্তাটার ডান দিক দিয়ে চলবে, কারণ ট্রাফিকের চলাচল নির্দিষ্ট দিক বা নিয়ম অনুসরণ করে

'ডান' ও 'বাঁয়ের' ধারণা এ কারণেই আপেক্ষিক। তাই পথ দেখানোর জন্য দেওয়া দিকনির্দেশনা আমাদের মনে অর্থ বা উপলব্ধি তৈরি করে।

এখন দিন না রাত?

এই প্রশ্নের উত্তর নির্ভর করবে অবস্থানের ওপর। রাশিয়ার দুটো শহরের কথাই ধরা যাক। মস্কোতে যখন দিন, রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্তকে তখন রাত। বিষয়টা অবাক করার মতো হলেও এখানে কোনো পরস্পর-বিরোধী তথ্য নেই। সোজা কথায়

বলতে গেলে, দিন আর রাত পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত ধারণা। তুমি জায়গার কথা উল্লেখ না করে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না। ঢাকা শহরে থেকে আমরা যখন বলি এখন রাত তখন বোঝায় এটা ঢাকা শহরেই রাত। গোটা পৃথিবীতে নয় নিশ্চয়ই। তোমাদের অনেকেরই হয়তো জানা আছে, ঢাকায় যখন রাত তখন আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে দিন। আবার নিউ ইয়র্কে যখন রাত তখন ঢাকায় দিন।

কে বড়?

নিচের ছবিতে রাখালটির আকৃতি অবশ্যই গরুটির চেয়ে বড় দেখা যাচ্ছে। পরে পৃষ্ঠার ছবিতে, গরুটি রাখালের চেয়ে বড়। এটা কোনো জটিল ব্যাপার নয় দুটি ছবি আঁকা হয়েছে দুটি ভিন্ন অবস্থান থেকে—একটি গরুর কাছ থেকে, আরেকটি রাখালের কাছ থেকে। ছবি আঁকার ক্ষেত্রে বস্তুর সঠিক (বাস্তব) আকার বা আয়তন দিতে হবে এমন কথা নেই বরং যে কৌণিক অবস্থান থেকে দেখে বস্তুকে আঁকা

রাখালের কাছ থেকে আঁকা

হয়েছিল সেই অবস্থান থেকে বস্তুর কৌণিক মাত্রা সঠিক রাখা জরুরি। যদিও বস্তুর কৌণিক মাত্রা শিল্পীর অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। বস্তুর কৌণিক মাত্রা নিয়ে কথা বলাটা অর্থহীন শোনাবে যদি-না অবস্থানকে স্থানে নির্দিষ্ট করা হয়। উদাহরণস্বরূপ '৪৫০ কোণ থেকে একটা টাওয়ার দেখা যাচ্ছে'—এ কথার কোনো অর্থ নেই। কিন্তু তুমি যদি বল যে, 'তোমার থেকে ১৫ মিটার দূরের একটি টাওয়ারের শীর্ষ তোমার অবস্থানে ভূমির সাথে ৪৫০ কোণে দেখা যাচ্ছে'—তাহলে তা পুরোপুরি অর্থবহ

হবে। কারণ ত্রিকোনমিতির সূত্রের সাহায্যে এতে আরো বোঝা যাচ্ছে মিনারটির উচ্চতা ১৫ মিটার। ফলে মিনারটির আকৃতি, দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়গুলো স্পষ্ট হবে

আপেক্ষিকতার পরম হয়ে ওঠা

পর্যবেক্ষণের দিক কিছুটা পরিবর্তন করলে কৌণিক মাত্রারও কিছুটা পরিবর্তন হবে। এ কারণেই কৌণিক মাপজোখ প্রায়শ জ্যোতির্বিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয় নাক্ষত্রিক মানচিত্রে নক্ষত্রগুলোর মাঝখানের কৌণিক দূরত্ব দেওয়া থাকে এ ক্ষেত্রে কৌণিক দূরত্ব বলতে পৃথিবীর সাপেক্ষে নক্ষত্রগুলোর কৌণিক দূরত্ব অর্থাৎ ওই কোণগুলো, যাতে পৃথিবী থেকে নক্ষত্রগুলোর মাঝখানের দূরত্ব দেখা যায়। পৃথিবীতে আমাদের চলাফেরা ও পর্যবেক্ষণের ভিন্ন অবস্থানের কথা চিন্তা করলেও আমরা সবসময় দেখব নক্ষত্ররাজি পরস্পর থেকে একটি নির্দিষ্ট ও একই দূরত্বে অবস্থান করছে। এমনটা মনে হওয়ার কারণ আসলে নক্ষত্রগুলো থেকে আমরা অকল্পনীয় দূরত্বে অবস্থান করছি সেগুলোর দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর এক অবস্থান থেকে আরেক

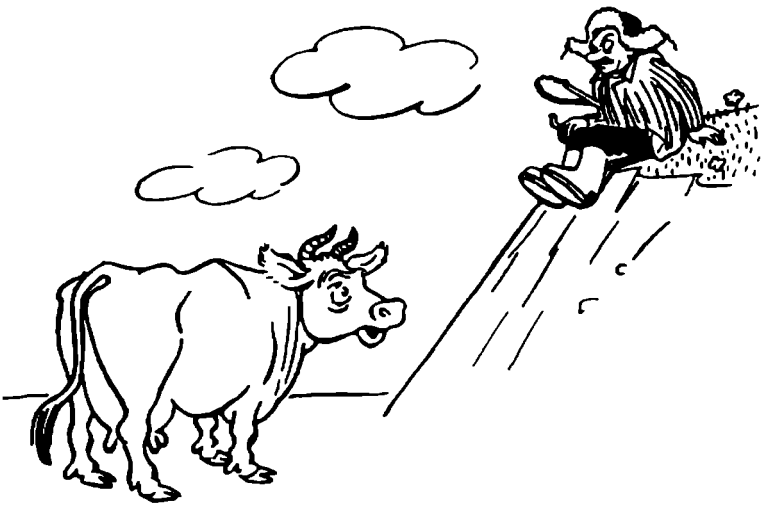

গরুর কাছ থেকে আঁকা

অবস্থানে আমাদের চলাচল এতই তাৎপর্যহীন যে, তা গণ্য না করলেও চলে। তাই এক্ষেত্রে কৌণিক দূরত্বকে প্রকৃত দূরত্ব হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

আমরা যদি সূর্যের চারদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনকে হিসাবের মধ্যে নেই তবে কৌণিক মাপজোখের ক্ষেত্রে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করব। যদিও সেটা তাৎপর্যপূর্ণ নয় মোটেও। যেভাবেই হোক যদি আমাদের পর্যবেক্ষণ স্থল সরিয়ে কোনো নক্ষত্রে (যেমন: সাইরাস) যাই, তাহলে সেখান থেকে দেখলে ছবিটির আমূল পরিবর্তন

ঘটবে। সব কৌণিক দূরত্বই ভিন্ন আর আমরা তখন আকাশে অনেক দূরের নক্ষত্রগুলোকে একসঙ্গে কাছাকাছি খুঁজে পাব। উল্টোটাও কিন্তু সম্ভব।

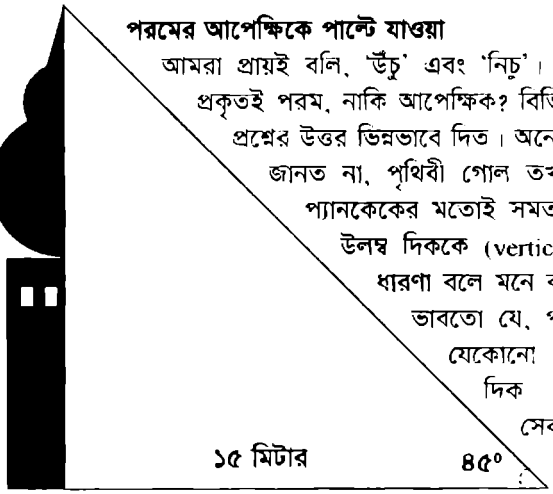

১৫ মিটার দূরে ৪৫° কোণ বলতে কী বোঝায় তা ছবিতে বর্ণনা করা হলো

পরমের আপেক্ষিকে পাল্টে যাওয়া

আমরা প্রায়ই বলি, 'উঁচু' এবং 'নিচু'। এই ধারণাগুলো কি প্রকৃতই পরম, নাকি আপেক্ষিক? বিভিন্ন সময়ে মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর ভিন্নভাবে দিত। অনেক আগে মানুষ যখন জানত না, পৃথিবী গোল তখন পৃথিবীকে একটি প্যানকেকের মতোই সমতল ভাবত। খাড়া বা **উলম্ব দিককে (vertical direction) পরম ধারণা** বলে মনে করতো। মানুষ তখন ভাবতো যে, পৃথিবীর উপরিভাগের যেকোনো জায়গা থেকে উলম্ব দিক একই থাকবে। সেকালে প্রকৃত 'উঁচু' ও প্রকৃত 'নিচু' নিয়ে কথা বলাটা কিন্তু পুরোপুরি স্বাভাবিক একটা ব্যাপার।

এক সময় আবিষ্কৃত হলো, পৃথিবী গোল। আর সেইসাথে উলম্ব এই ধারণাটাও শেষ হয়ে গেল।

আসলে গোলাকার হওয়ায় পৃথিবীর উলম্ব দাগের দিক স্বাভাবিকভাবে নির্ভর করে পৃথিবীপৃষ্ঠের সেই স্থানটির উপর যার মধ্য দিয়ে ওই রেখাটি অতিক্রম করেছে।

গোলাকার পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উলম্ব বা খাড়া গতিপথ ভিন্ন ভিন্ন রকম হবে, সেটাই স্বাভাবিক। যদি প্রশ্ন করা হয়, কোনো বস্তু ছুড়ে মারা হলে উপরে না নিচে পড়বে। তাহলে তার নিখুঁত উত্তর হলো ভূমিতে পড়বে ফলে পরম হয়ে গেলো আপেক্ষিক। কারণ আমরা চারপাশটা খুব বেশিদূর দেখতে পাই না। খোলা প্রান্তর বা সমুদ্র থেকে ৩২ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্ত দিয়ে ঘেরা আমাদের দৃষ্টিসীমা। আকাশটা তাই মনে হয় উচু দিকে, ভূমিটা নিচু দিকে। আসলে এ বিশ্বে উঁচু নিচুর স্থান নেই।

এভাবে 'উপর' ও 'নীচ'-এর ধারণাটাই হারিয়ে যেত যদি পৃথিবীর উপরিভাগের স্থানটি নির্দিষ্ট করে বলা না-হতো আসলে এই বিশ্বে খাড়া গতিপথ নেই। তাই মহাকাশ বা মহাশূন্যের যেকোনো দিকের জন্যই পৃথিবীপৃষ্ঠের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকে গুরুত্ব দিতে পারি, যে বিন্দু হতে এই দিক হবে উলম্ব বা খাড়া।

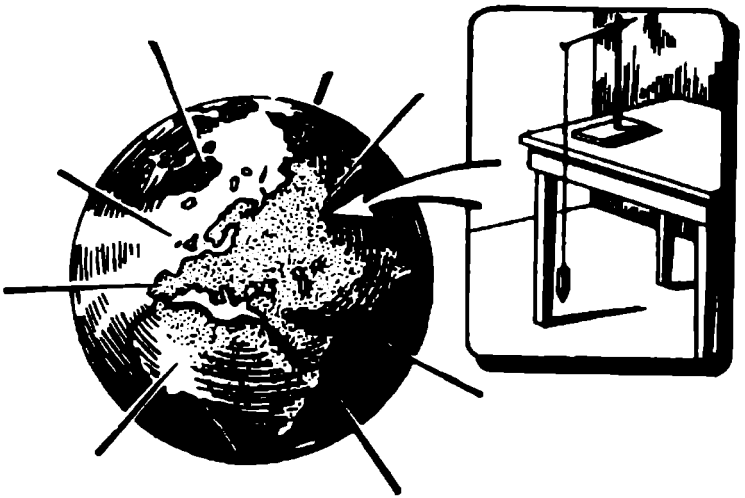

আমরা খাড়া পথের বা দিকের আপেক্ষিকতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে শুরু করি কেবল তখনই যখন পৃথিবীপৃষ্ঠের দুটি স্থান যথেষ্ট দূরে থাকে অথবা বিবেচনা করি। যেমন, মস্কো ও নিউজিল্যান্ড

'সাধারণ জ্ঞান' যাতে আপত্তি জানায়

বর্তমানে আমাদের সামনে 'উপর', 'নীচ' ব্যাপারটি এত পরিষ্কারভাবে উঠে এসেছে তাতে এটি সম্বন্ধে নূন্যতম সন্দেহের অবকাশ নেই। তারপরও ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, মানুষের পক্ষে 'উপর'-'নীচ'-এর আপেক্ষিকতা বোঝা সহজ ছিল না মানুষ তাদের এই ধারণাকে পরম জ্ঞান হিসেবে বর্ণনা করেছিল কেননা তাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় আপেক্ষিকতার বিষয়টি স্পষ্ট ছিল না (যেমনটি ঘটে 'ডান' এবং 'বাঁ'-ধারণার ক্ষেত্রে)।

আমরা স্মরণ করি যে, 'পৃথিবী গোল' এ ধারণাটি মধ্যযুগে অন্ধ বিরোধিতার মুখে পড়েছিল সেসময় তাদের মাথায় ঢুকত না সেটা কীভাবে সম্ভব। কারণ তাহলে যে মানুষকে পৃথিবীর উল্টোপথে হাঁটতে হয়। অবুঝের মতো তাদের প্রশ্ন ছিল—মানুষ কীভাবে পৃথিবীর উল্টোপিঠে হাঁটতে পারে?! আর এ কারণে পৃথিবী গোলাকার মতবাদ তারা মনে নিতে পারেনি।

এই যুক্তিটি ভুল। কারণ পৃথিবীর গোলত্বের ধারণা উলম্বদিকের পরমত্বকে গুরুত্ব দেয় না। কারণ এটা পৃথিবীর গোল হওয়ার জন্য বাঁধা স্বরূপ।

খাড়া দিকের আপেক্ষিকতাকে স্বীকার না করলে এবং মস্কোয় এটাকে পরম বলে ধরলে উদাহরণস্বরূপ, নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীরা উল্টোপিঠে হাঁটবে। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে, নিউজিল্যান্ডের অধিবাসীরাও ভাববে যে, মস্কোর

অধিবাসীরা পৃথিবীর উল্টো দিকে হাঁটছে এখানে আসলে কোনো বৈপরীত্য নেই। কারণ উলম্ব দিক সত্যিকার অর্থে পরম নয় বরঞ্চ এটি একটি আপেক্ষিক ধারণা।

আমরা খাড়া পথের বা দিকের আপেক্ষিকতার প্রকৃত অর্থ বুঝতে শুরু করি কেবল তখনই যখন পৃথিবীপৃষ্ঠের দুটি স্থান যথেষ্ট দূরে থাকে অথবা বিবেচনা করি। যেমন, মস্কো ও নিউজল্যান্ড উদাহরণস্বরূপ অন্যদিকে পৃথিবীপৃষ্ঠে কাছাকাছি অবস্থানের দুটি বিন্দু দেখি যেমন— মস্কো বা ঢাকার দুটি বাড়ি। তাহলে দেখব যে, বাড়ি দুটির মধ্যকার সমস্ত উলম্বরেখা তাদের কাছে বাস্তবিকই সমান্তরাল মনে হবে। ফলাফল হিসেবে সব রকমের উলম্ব ধারণা পরম বলে বিবেচিত হবে।

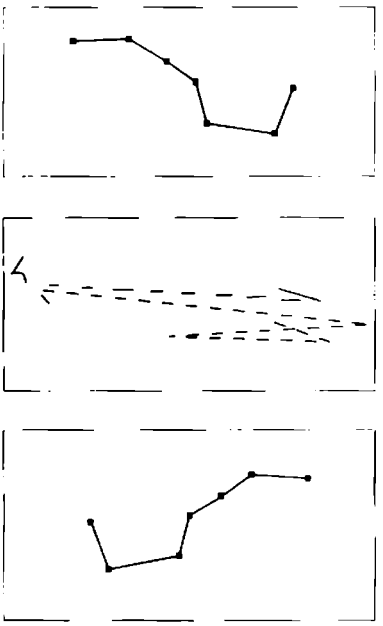

বিগ ডিপার, পৃথিবী থেকে দেখা (উপরে), পার্শ্ব থেকে দেখা (মাঝে), এবং পিছন দিক থেকে দেখা (নিচে)। শেষের দুটি দৃশ্য দেখা যাবে যদি আমরা ১৫০ আলোকবর্ষ দূরে সঠিক সুবিধাজনক অবস্থান ভ্রমণে সামর্থ্য হই।

শুধুমাত্র যখন আমরা পৃথিবীর উপরিভাগের আয়তনের তুলনামূলক আলোচনা করবো ঠিক তখনই এই পরম উলম্ব পথের ধারণা উদ্ভট যুক্তিহীন আর বিপরীতধর্মী হয়ে দাঁড়াবে

উপরে যেসব উদাহরণ আলোচনা করা হলো তার মধ্যে প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক ধারণাই আপেক্ষিক। এসব ধারণা তখনই অর্থপূর্ণ হয় যখন আমরা পর্যবেক্ষণের শর্তগুলোকে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করবো অথবা কী সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণ করছি তা বিবেচনা করবো।

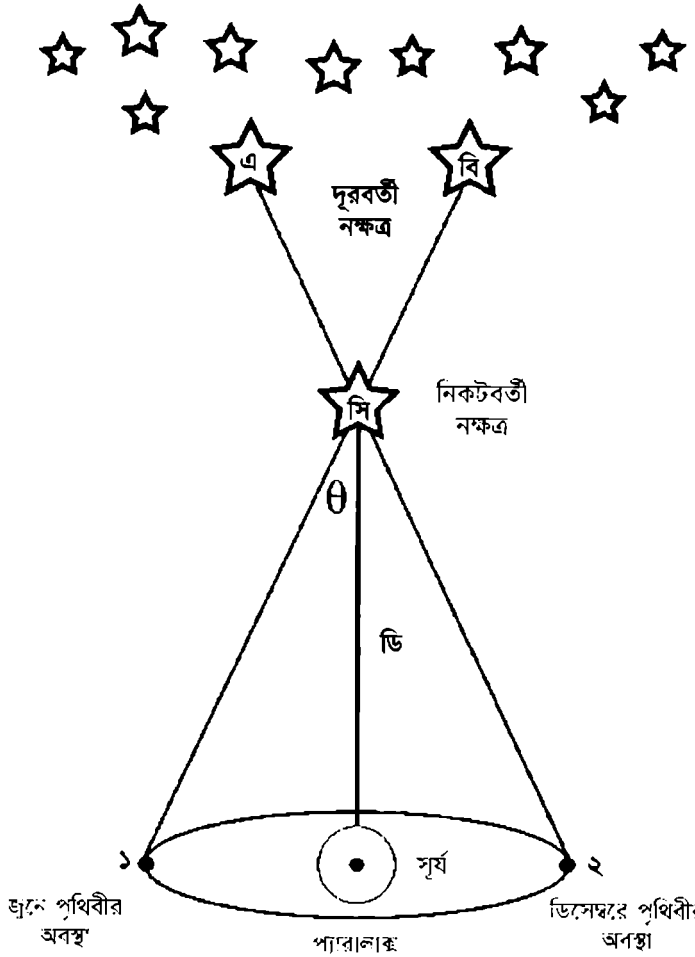

পর্যবেক্ষণের দিক কিছুটা পরিবর্তন করলে কৌণিক মাত্রারও কিছুটা পরিবর্তন হবে। এ কারণেই প্রায়শই জ্যোতির্বিজ্ঞানে কৌণিক মাপজোখ ব্যবহৃত হয়। পৃথিবীতে আমাদের চলাফেরা ও পর্যবেক্ষণের ভিন্ন অবস্থানের কথা চিন্তা করলেও আমরা সবসময় দেখব নক্ষত্ররাজি পরস্পর থেকে একটি নির্দিষ্ট ও একই দূরত্বে অবস্থান করছে। এমন কি সূর্যের চারিদিকে আবর্তনের সময়ও এটার তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে না। এটার কারণ আসলে নক্ষত্রগুলো থেকে আমরা অকল্পনীয় দূরত্বে অবস্থান। সেগুলোর দূরত্বের তুলনায় পৃথিবীর এক অবস্থান থেকে আরেক অবস্থানে আমাদের চলাচল এতই তাৎপর্যহীন যে, তা গণ্য না করলেও চলে। তাই এক্ষেত্রে কৌণিক দূরত্বকে গুরুত্ব না দিলেও হিসাবের তেমন ক্ষতি হয় না। প্রত্যহিক জীবনে আমরা কখনোই এ ধারণার সঙ্গে দ্বন্দ্বে যাব না যে, এটি একটি পরম সত্য। কিন্তু আমরা সৌরজগতের বাইরে গেলে এবং দুটি নক্ষত্রকে মহাশূন্যের অন্য স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করলে এটি ভিন্ন হবে। আমরা খুঁজে পাব যে কৌণিক দূরত্ব শূন্য থেকে বেশ আলাদা

দ্বিতীয় অধ্যায় | স্থান আপেক্ষিক

একটি ও একই জায়গা, নাকি তা নয়?

প্রায়ই আমরা বলি যে, ঘটনা দুটি একই স্থানে ঘটেছিল। এসব ক্ষেত্রে আমাদের বর্ণনায় পরম অর্থ আরোপ করার একটা প্রবণতা থাকে। কিন্তু বাস্তবতায় এর কোনো অর্থ নেই। এ কথাটি সমার্থক হবে কোনো স্থান, যেমন—মস্কো, না শিকাগো তা সুনির্দিষ্ট না করে 'এখন পাঁচটা বাজে' বলার মতোই।

এটা ভালোভাবে বুঝতে হলে আমাদের কল্পনা করতে হবে যে, দুজন ভ্রমণকারী মস্কো-ভ্লাদিভোস্টক-গামী এক্সপ্রেস ট্রেনের একই কামরায় রোজ দেখা করত এবং তাদের স্বামীদের কাছে চিঠি পাঠাত। তাদের স্বামীরা খুব কমই একমত হতো আমরা যদি বলতাম যে, তাদের স্ত্রীরা একটি স্থানের একই জায়গায় দেখা করে। তারা কোনো কারণ ছাড়াই বলত যে, সাক্ষাতের ওই জায়গাগুলো তো কয়েকশ' কিলোমিটার দূরে দূরে তারা কি চিঠি পেত না বিভিন্ন শহর—যথাক্রমে ইয়ারোস্লাভেল, পার্ম, সের্ডলভস্ক (Sverdlovsk), তুমেন (Tumen), ওমস্ক (Omsk) এবং খাবারোভস্ক (Khabarovsk) থেকে পর্যায়িকভাবে।

ভ্রমণের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের এই দুটি ঘটনায় স্ত্রীদের ধারণা, তাদের চিঠি লেখার ঘটনা ঘটেছে একটি এবং একই স্থানে। আর স্বামীদের দৃষ্টিকোণ থেকে জায়গাগুলো কয়েকশ' কিলোমিটার দূরে।

কারা সঠিক — স্ত্রীরা, নাকি তাদের স্বামীরা? আমাদের কাছে তাদের কোনো পক্ষকে সমর্থন করার ভিত্তি নেই 'স্থানের এক এবং একই বিন্দুতে ধারণাটি' যে আপেক্ষিক তা আমাদের কাছে পুরোপুরি স্পষ্ট।

একইভাবে, আকাশের দুটি তারা বা নক্ষত্রের অবস্থান মিলে গেছে এই উপলব্ধি হতে পারে যদি শুধুমাত্র তাদের পর্যবেক্ষণকে পৃথিবী থেকে নির্দিষ্ট করা হয়।

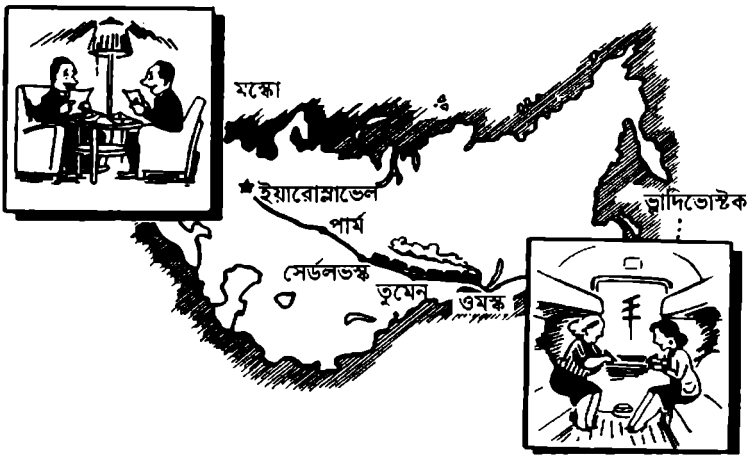

মস্কো থেকে ভ্লাদিভোস্টকগামী ট্রেনের বিভিন্ন সময় একই কামরায় যাত্রীরা দেখা করলেও ট্রেনটি সময়ান্তরে জায়গা পরিবর্তন করেছে। ফলে ট্রেনের ভেতরে ওগুলো একই জায়গা হলেও বাইরে থেকে ওই সময়গুলোতে তা কয়েকশ কিলোমিটার দূরে

তাই কোনো স্থানে দুটি ঘটনা একই সঙ্গে ঘটেছে—বলা যাবে তখনই যদি আমরা ওই ঘটনাগুলোর সাপেক্ষে পর্যবেক্ষণের অবস্থান উল্লেখ করি।

তাই স্থানে অবস্থানের ধারণাটিও আপেক্ষিক। যখন আমরা কোনো স্থানে বস্তুর অবস্থান নিয়ে কথা বলব, তখনই অন্য বস্তুর সাপেক্ষে এর আপেক্ষিক অবস্থানের নিহিতার্থ তুলে ধরব। যদি সুনির্দিষ্ট কোনো বস্তুর অবস্থান সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারি, তাহলে প্রশ্নে অর্থের অভাব আছে।

একটি বস্তু সত্যিকার কীভাবে চলতে পারে

উপরের আলোচনায় এটা বোঝা যায় যে, 'স্থানে কোনো বস্তুর অবস্থান পরিবর্তনের' ধারণাও আপেক্ষিক। যদি আমরা বলি যে, বস্তুটি স্থান পরিবর্তন করেছে, তাহলে আমরা বুঝি যে, এটি শুধু অন্যান্য বস্তুর সাপেক্ষে আপেক্ষিকভাবে অবস্থান পরিবর্তন করেছে।

যদি আমরা বিভিন্ন দিক থেকে কোনো বস্তুর গতি পর্যবেক্ষণ করি তাহলে দেখব তাদের আপেক্ষিক অবস্থান পরিবর্তিত হচ্ছে। আমরা আরো লক্ষ্য করব যে, এটির গতিও পরিবর্তিত হচ্ছে।

ধরা যাক, একটি উড়ন্ত বিমান থেকে খুব ছোট কিন্তু ভারি পাথর ফেলা হল। পাইলট নিচের দিকে তাকিয়ে থাকলে বিমানের দিক থেকে মনে হবে সোজা পথে বুঝি ফেলা হয়েছে। কিন্তু পৃথিবীর সাপেক্ষে কেউ পাথর ফেলার দৃশ্যটি দেখলে, তার মনে হবে, এটা বাঁকানো পথে পড়েছে। বাঁকানো এই পথ প্যারাবোলা বা অধিবৃত্ত হিসেবে পরিচিত

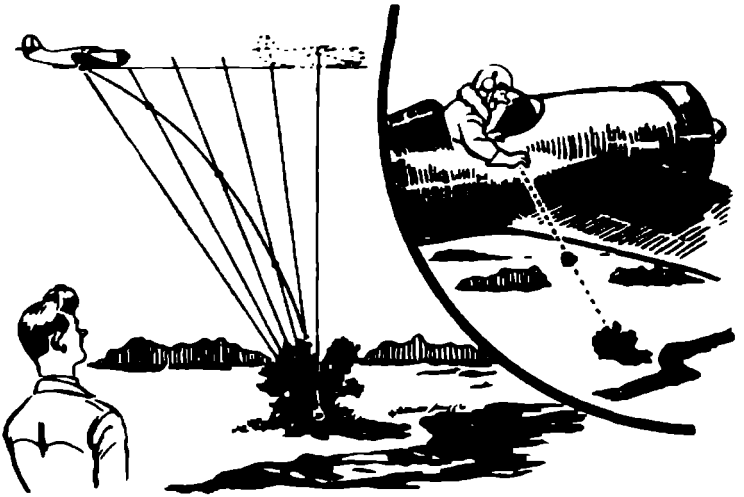

পাথরের পরিভ্রমণকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গা থেকে দেখলে আমরা বিভিন্ন ধরনের বক্ররেখা দেখতে পাই

বাস্তবে কীভাবে একটি পাথর পরিভ্রমণ করে?

এই প্রশ্নের অল্পই অর্থ রয়েছে যা চাঁদকে নির্দিষ্ট কোণ থেকে দেখার বাস্তবতার মতোই যদি সূর্য থেকে বা পৃথিবী থেকে দেখা হয়?

ঠিক বিল্ডিংয়ের ফটোগ্রাফের মতোই আপেক্ষিক একটি গতিশীল বস্তুর বক্র গতিপথ। একটি বিল্ডিংয়ের সামনের থেকে অথবা পেছনের থেকে ছবি তুললে ভিন্ন ভিন্ন ছবি পাই, ঠিক তেমনি একটি পাথরের পরিভ্রমণকে ভিন্ন ভিন্ন স্থান থেকে দেখলে আমরা বিভিন্ন রকম বক্ররেখা পাই

দেখার জন্য সকল বিন্দুই কি সমতুল্য?

এবার চল, বস্তুর চলার বা সঞ্চারপথ নিয়ে আলোচনা করি। আলোচনার প্রথমেই পর্যবেক্ষণের অবস্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। আলোচনার সুবিধার্থে সরল ও সুবিধাজনক অবস্থান থেকে আমাদের পর্যবেক্ষণের জায়গা নির্বাচন করতে হবে। উল্লেখ্য সঞ্চারপথ হচ্ছে যে বক্ররেখা বরাবর বস্তু চলাচল করে।

একজন ভালো ফটোগ্রাফার তার ক্যামেরার জন্য যখন জায়গা নির্বাচন করেন, তিনি তখন অন্যান্য জিনিসের পাশাপাশি তার ছবির নান্দনিক দিক এবং এর গঠন নিয়েও সজাগ থাকেন।

কিন্তু কোন স্থানে বস্তুর গতি পর্যবেক্ষণে আমাদের আগ্রহ আরো বিস্তৃত থাকে। আমরা যে শুধু বস্তুর ভ্রমণের বক্রপথই জানতে চাই তা নয়, বরং নির্দিষ্ট শর্ত সাপেক্ষে একটি বস্তুর গতিপথ অনুমান করে থাকি অন্য কথায়, আমরা বস্তুর

গতিপথের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নিয়মগুলো জানতে চাই, যেসব নিয়ম বস্তুগুলোকে একপথে অথবা অন্যপথে চলতে প্রভাবিত করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গতির আপেক্ষিকতা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে দেখা যায় যে, স্থানে সব অবস্থানই সমতুল্য নয়।

যদি আমরা ফটোগ্রাফারকে বলি আমাদের আইডি কার্ডের জন্য একটি ছবি তুলে দিতে, তবে আমরা চাইব আমাদের মুখটির ছবি তোলা হোক, মাথার পেছনের দিকটা নয়। এটাই নির্ধারণ করবে স্থানের কোন অবস্থানটি থেকে সে ছবি তুলবে অন্য কোনো অবস্থান আমাদের প্রয়োজন মেটাতে পারবে না।

স্থির অবস্থার সন্ধান পাওয়া।

কোনো বস্তুর গতিকে বাইরের বল প্রভাবিত করে। এই প্রভাবের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ গতি সমস্যায় পুরোপুরি নতুন ধারণা নিয়ে এসেছে।

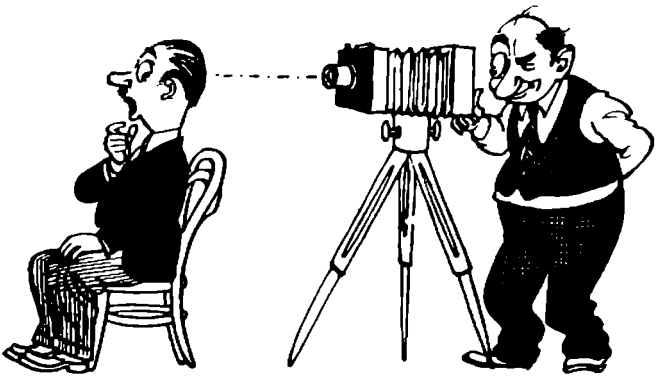

মনে করি যে, আমাদের হাতে এমন একটি বস্তু রয়েছে যা বাইরের কোনো বল দ্বারা প্রভাবিত হয় না। এই বস্তুটি আমাদের পর্যবেক্ষণের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে বিভিন্নভাবে, কম-বেশি বিচিত্র রীতিতে চলবে। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, পর্যবেক্ষকদের জন্য সবচেয়ে স্বাভাবিক অবস্থান হবে একটাই। আর বুঝতেই পারছো সে অবস্থানে বস্তুটি সোজা কথায় স্থির অবস্থায় থাকবে।

তাই আমরা এখন একটি নির্দিষ্ট বস্তুর আপেক্ষিক চলাফেরা বিবেচনা না করেই স্থির অবস্থার নতুন সংজ্ঞা দেব এভাবে, একটি বস্তু স্থির অবস্থায় যেকোনো বহিঃস্থ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থাকবে।

জড় কাঠামো (Inertial Frame)

কীভাবে আমরা স্থির অবস্থাটা জানতে পারি? কখন আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে, একটি বস্তু বহিরাগত কোনো বল দ্বারা প্রভাবিত হবে না?

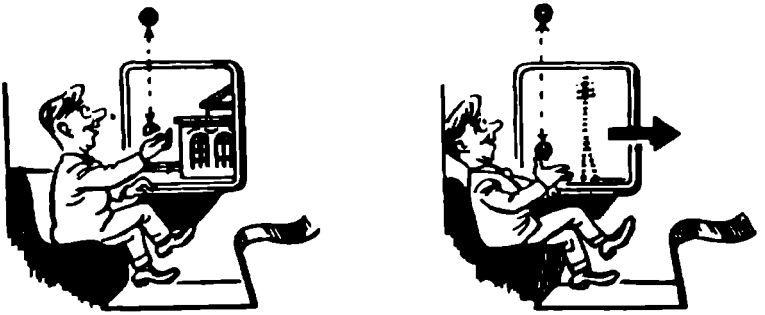

চলন্ত ট্রেনে একটি বল বাতাসে লম্বভাবে উপরে ওঠালে বাঁকাভাবে না পড়ে বরঞ্চ কিছুটা পিছিয়ে তোমার হাতে পড়বে

এই উদ্দেশ্যে, আমাদের অবশ্যই ওই বস্তুকে অন্যান্য বস্তু থেকে এমন এক দূরত্বে নিয়ে যাওয়া উচিত যাতে অন্য বস্তু তাতে প্রভাব ফেলতে না পারে

কল্পনায় ওই ধরনের জড়বস্তু দিয়ে কোনো কাঠামোর মতো আমরা একটা গবেষণাগার নির্মাণ করতে পারি এবং এই গবেষণাগার থেকে পর্যবেক্ষণে গতির ধর্ম নিয়ে আলোচনাও করতে পারি . এই অবস্থাকে আমরা স্থির অবস্থা হিসেবে বিবেচনা করি।

যদি গতির ধর্মগুলো অন্য গবেষণাগার থেকেও পর্যবেক্ষণ করা যায় এবং তা আমাদের গবেষণাগারের পর্যবেক্ষণ থেকে আলাদা হয়, তবে আমরা যথার্থই বলব যে, প্রথম গবেষণাগারটি ছিল চলমান।

ট্রেনটি কি চলে?

আমরা চলমান গবেষণাগারে গতির যে নিয়মগুলো প্রতিষ্ঠা করি তা জড় গবেষণাগার থেকে ভিন্ন হলে, মনে হচ্ছে, গতির ধারণা তার আপেক্ষিক চরিত্র হারিয়ে ফেলবে। আমাদের তখন শুধুমাত্র গতির আপেক্ষিক জড়তার কথাই বলতে হবে এবং একে আমরা পরম হিসেবে উল্লেখ করবো।

কিন্তু গবেষণাগার গতিশীল হলে কী হবে? সেক্ষেত্রে কি জড় গবেষণাগারে বিদ্যমান নিয়মগুলো প্রতি ক্ষেত্রে পরিবর্তিত হবে?

এসো একই গতিতে সরলরেখায় চলতে থাকা ট্রেনে চড়ে আমরা কামরার ভেতরের বস্তুগুলোর আচরণ লক্ষ করি। তারপর থেমে থাকা ট্রেনের সঙ্গে সেসবের তুলনা করবো। আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা বলে যে, একটি ট্রেন একই গতিতে সরলরেখায় চললে বস্তুগুলোর গতি নিশ্চল ট্রেনের মতোই হবে। চলন্ত ট্রেনে একটি বল বাতাসে লম্বভাবে উপরে ওঠালে বাঁকাভাবে না পড়ে বরঞ্চ কিছুটা পিছিয়ে তোমার হাতে পড়বে।

তবে ট্রেনটা চলার শুরুতে হঠাৎ করে যে ঝাঁকুনি দেয় সে সময় অন্যরকম আচরণ করে। সে-অভিজ্ঞতা তোমাদের অনেকেরই আছে। নিউটন একে বলেন, স্থির জড়তার প্রভাব। যাই হোক, আমরা চলার প্রারম্ভে অনিবার্য আকস্মিক ঝাঁকি বাদ দিলে, একটি চলন্ত ট্রেনের ভেতরের সবকিছু এমন আচরণ করবে যেন ট্রেনটি স্থির অবস্থায় রয়েছে, চলছে না।

যখন ট্রেনটির গতি চালক কমাবে বা বাড়াবে তখনকার কথা আলাদা। প্রথম ক্ষেত্রে, আমরা সামনের দিকে আকস্মিক ঝাঁকি অনুভব করবো আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পেছনের দিকে। অবস্থাটা স্থির দশা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা।

একটি ট্রেন একই গতিতে চলতে চলতে দিক পরিবর্তন করলে আমরাও তা হঠাৎ অনুভব করব। ডান দিকে সরাসরি মোড় ঘোরানোর সময় আমরা যানটির বাম দিকে চাপ প্রয়োগ করবো বা ঝুঁকে পড়বো। গাড়িটি বাম দিকে মোড় নিলে উল্টোটি ঘটবে। অর্থাৎ ডানদিকে ঝুঁকে পড়বো।

পর্যালোচনা শেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কোনো স্থির গবেষণাগারের সাপেক্ষে একইভাবে ও সরলরৈখিকভাবে আরেকটি গবেষণাগার চললে শেষের গবেষণাগারে বস্তুগুলোর আচরণে কোনো বিচ্যুতি পর্যবেক্ষণ করা অসম্ভব ফলে এগুলোকে জড় কাঠামো বলবো। আর চলন্ত গবেষণাগারের গতির যদি পরিবর্তন ঘটে (ত্বরণ, মন্দন, দিক পরিবর্তন) তার ফলাফল বস্তুগুলোর আচরণ থেকে অনুভূত হবে। ত্বরণ ও মন্দন হচ্ছে গতির পরিবর্তন। একটিতে বৃদ্ধি ঘটে, অপরটিতে হ্রাস হয়।

ট্রেনটি চলতে চলতে হঠাৎ দিক পরিবর্তন বা গতি পরিবর্তন করলে ঝাঁকিতে এ ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে

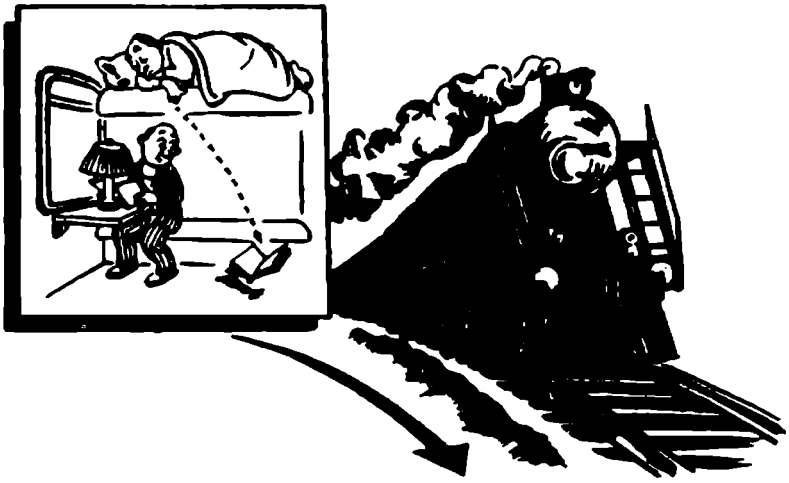

ট্রেন একই গতিতে সরলরেখায় চললে ভেতরের বস্তুগুলোর গতি নিশ্চল ট্রেনের মতো হবে। কোনো ঝাঁকির সৃষ্টি হবে না

স্থির অবস্থার চিরবিদায়

অবাক করা বিষয় যে, একই সরলরৈখিক গতিতে কোনো গবেষণাগার এর বস্তুর আচরণের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না, বরং স্থির অবস্থার ধারণা সংশোধনে বাধ্য করে। এ থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, স্থির অবস্থা এবং সমরৈখিক গতির মধ্যে কোনো তফাৎ নেই

একইভাবে কোনো কোনো স্থির অবস্থার গবেষণাগারের সাপেক্ষে একটি সমরৈখিকভাবে চলা গবেষণাগারকেও স্থির অবস্থায় বিবেচনা করা যেতে পারে। তার মানে এই যে, সম্পূর্ণ স্থির অবস্থা বলে কিছু নেই কিন্তু বিভিন্ন রকমের অগণ্য সংখ্যক 'স্থির অবস্থা' রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, অগণ্য সংখ্যক গবেষণাগার স্থির অবস্থায় রয়েছে তাদের সবগুলোই একে অন্যের সাপেক্ষে একই ও সরলরৈখিকভাবে বিভিন্ন গতিতে চলছে

যেহেতু স্থির অবস্থা পরম নয় বরং আপেক্ষিক, তাই আমাদের প্রত্যেক সময়ই উল্লেখ করতে হবে, পরস্পরের সাপেক্ষে সমরৈখিক গতিতে চলা অসংখ্য গবেষণাগারের কোনটির গতিকে কার প্রেক্ষিতে আমরা পর্যবেক্ষণ করছি

এভাবে আমরা গতিকে একটি পরম ধারণা হিসেবে তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছি।

কোন 'স্থির অবস্থা'র সাপেক্ষে আমরা যে গতিটি পর্যবেক্ষণ করি তাও একটি প্রশ্ন যা সব সময়ের জন্য প্রযোজ্য। এভাবে আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতিক নিয়মের কাছাকাছি চলে এসেছি। সাধারণত একে বলা হয় আপেক্ষিক গতি তত্ত্ব বা প্রিন্সিপল অফ রিলেটিভ মোশন (Principle of Relative Motion)

এই তত্ত্ব বলে যে, ওই চলন্ত বা স্থির গবেষণাগার বা কাঠামোগুলোয় যে বস্তুগুলো পরস্পরের সাপেক্ষে সমরৈখিকভাবে গতিশীল সেগুলোও ওই একই নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হবে

জড়তার সূত্র

গতির আপেক্ষিকতার নীতি বলে যে, একটি বস্তু যা বাইরের বলের প্রভাবাধীন নয় তা স্থির অবস্থায় থাকতে পারে অথবা সমরৈখিকভাবে গতিশীল হতে পারে— এই নীতিকে পদার্থবিদরা জড়তার আইন বা সূত্র (Law of Inertia) বলেন।

তবুও আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে এই আইনের কার্যকারিতা আড়াল হয়ে আছে এবং তা সরাসরি প্রতীয়মান হয় না। জড়তার সূত্র অনুযায়ী একটি বস্তু একই সরলরৈখিক গতিতে থাকলে এর গতি চিরকাল টিকে থাকবে যদি না বাইরের কোনো বল এর ওপর কাজ করে। তারপরও আমাদের পর্যবেক্ষণ দেখায় যে, আমরা যদি কোনো বস্তুর ওপর জোর না খাটাই, এটা থেমে বা স্থির হয়ে যেতে বাধ্য।

এই ধাঁধার উত্তর নিহিত আছে যে বাস্তবতায় তা হলো, যেসব বস্তু আমরা দেখি তা ঘর্ষণশক্তি-জনিত নির্দিষ্ট বাইরের বলের প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা। একটি বাসের কথা ধরা যাক, যখন বাসটি চলে তখন এর উপর অনেকগুলো বল প্রভাব ফেলে। যেমন—টায়ারের ঘর্ষণ, বাতাসের গতি, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি। এসব বলের প্রভাবে বাসটা সবসময় সমান গতিতে চলতে পারে না এবং এক সময় থেমে যেতে বাধ্য হয়। কিন্তু বাসটিকে যদি এমন কোথাও চালানো যেতো যেখানে এ ধরনের কোন বল প্রভাব ফেলতে পারবে না—তাহলে কী হতো? বাসটি সমগতিতে চিরকাল চলতে থাকতো জড়তার সূত্র পর্যবেক্ষণে যে শর্ত আমাদের প্রয়োজন, অর্থাৎ বস্তুর উপর ক্রিয়ারত বাইরের বলের অনুপস্থিতি—তা খুবই দুর্লভ। এরপরও পরীক্ষার শর্তগুলোর উন্নতি ঘটিয়ে অর্থাৎ ঘর্ষণের বল কমিয়ে জড়তার নিয়ম পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় আদর্শ ব্যবস্থার উপস্থাপন আমরা করতে পারি। সেই অনুযায়ী প্রমাণ হয় যে, এই আইন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের গতি পর্যবেক্ষণেও বৈধ

গতির আপেক্ষিক নীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটা হলো মানুষের মহান আবিষ্কারগুলোর একটি এছাড়া পদার্থবিদ্যা কোনোভাবেই উন্নতি লাভ করতো না। আমরা এই আবিষ্কারের জন্য গ্যালিলিওর প্রতিভার কাছে ঋণী, যিনি সাহসিকতার সঙ্গে গ্রিক চিন্তাবিদ ও দার্শনিক এরিস্টটলের শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন। ওই সময়ে এরিস্টটলের ধারণাগুলো প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল এবং তা খ্রিস্টান ক্যাথলিক চার্চের জোরালো সমর্থন পেয়েছিলেন। এরিস্টটলের মতে, গতি সঞ্চালন শুধু তখনই সম্ভব যখন শক্তি প্রয়োগ করা হয় এবং তা না হলে অনিবার্যভাবে থেমে যাবে গ্যালিলিও অসাধারণ কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে এর ঠিক বিপরীত দিকটা প্রমাণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, চলন্ত বস্তুদের ঘর্ষণ স্থির অবস্থায় নিয়ে আসে কিন্তু

কোনো ঘর্ষণ না থাকলে একটি বস্তুর মধ্যে একবার গতি সঞ্চালিত হলে তা সবসময় চলতেই থাকবে।

গতিবেগও আপেক্ষিক!

গতির আপেক্ষিক নীতি অনুসারে জানা যায় যে, কোনো বস্তুর সমরৈখিক গতিতে নির্দিষ্ট বেগে চলা একটি অর্থহীন ধারণা, যদি না কোনো জড় কাঠামোকে আমরা সুনির্দিষ্টভাবে আরোপ করি যার সাপেক্ষে ওই নির্দিষ্ট বেগ মাপা যায়। একই কথা বলা যায় দ্রাঘিমা রেখার ধারণা প্রসঙ্গে, যদি না আমরা কোন মধ্যরেখা থেকে এটি পরিমাপ করবো তা উল্লেখ করি।

এভাবে বোঝা যায় যে, গতিবেগও একটি আপেক্ষিক ধারণা যদি আমরা নির্ণয় করি যে, বিভিন্ন জড় কাঠামোর সাপেক্ষে সমরৈখিক গতিতে চলন্ত বস্তুর গতিবেগ নির্ধারণে আমরা পাব ভিন্ন ফলাফল।

তারপরও বেগের প্রতিটি পরিবর্তন বাড়বে, না কমবে অথবা দিক পরিবর্তন করবে— তা অর্থের দিক থেকে পরম এবং যেখান থেকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি সেই কাঠামোর অবস্থানের উপর নির্ভরশীল নয়।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আলোর শোকগাথা

আলোর বিস্তার মুহূর্তে বা ঝটপট হয় না

আমরা নিজেদেরকে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে গতির আপেক্ষিকতা এবং অসংখ্য জড়-কাঠামোর অস্তিত্ব দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করেছি। পরবর্তীকালে জেনেছি যে জড় কাঠামোতে বস্তুর গতিকে চালিত করার নিয়মও একই রকম তারপরও এক ধরনের গতির অস্তিত্ব রয়েছে। প্রথম দর্শনে উপরে আমরা যে নীতিগুলো প্রতিষ্ঠা করেছি সেগুলোর সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে যায় বা স্ববিরোধিতায় পড়ে। এটা হচ্ছে আলোর গতি বা আলোক সঞ্চারণ। আলোক সঞ্চারণ বা বিস্তার হচ্ছে আলোর গোলাকারভাবে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা।

আলোর সঞ্চারণ তাৎক্ষণিক বা ঝটপট হয় না, যদিও এর গতি আসলে প্রচণ্ড—সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার বা ১ লাখ ৮৬ হাজার মাইল! অর্থাৎ এক সেকেন্ডে সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। সূর্য থেকে নয় কোটি ৩০ লক্ষ মাইল পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে পৌঁছতে আলোর সময় লাগে মাত্র ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড।

এমন গতিবেগ কল্পনা করাও কঠিন, কেননা আমরা প্রতিদিন এর চেয়ে অনেক অনেক কম গতি নিয়ে কাজ করি। উদাহরণস্বরূপ, প্রথম দিককার রাশিয়ার (সেই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল) মহাকাশযানের রকেটের গতি ছিল সেকেন্ড মাত্র ১২ কিলোমিটার। যেসব মহাজাগতিক বস্তু নিয়ে আলোচনা করেছি তাদের মধ্যে সূর্যের চারপাশে পৃথিবীর প্রদক্ষিণ গতি সবচেয়ে বেশি কিন্তু তারপরও পৃথিবীর গতি সেকেন্ডে মাত্র ৩০ কিলোমিটার। বর্তমানে ভয়েজার মহাকাশযানের গতি আরো বেশি, সেকেন্ডে ৪২ মাইল। এই গতিতে ভয়েজারের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্রে যেতে সময় লাগবে দশ হাজার বছর আর আলোর সময় লাগবে মাত্র চার বছর।

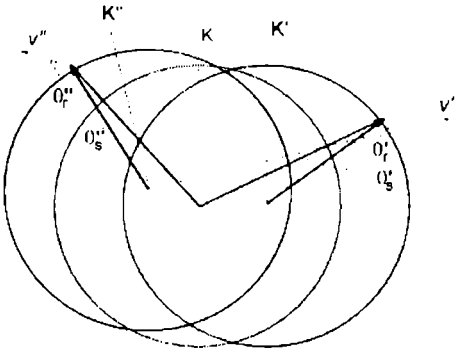

আলোক সঞ্চারণ বা বিস্তার হচ্ছে আলোর গোলাকারভাবে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা

আলোর গতিবেগের পরিবর্তন হওয়া কি সম্ভব?

আলোক সঞ্চারণের প্রচণ্ড বেগ স্বয়ং খুব বিস্ময়কর। আরো চমকপ্রদ বিষয় হচ্ছে, এই গতি কঠিনভাবে স্থির থাকে, যেকোনো পরিস্থিতিতে শূন্যস্থানে স্থির থাকে।

তুমি সবসময় কৃত্রিম উপায়ে একটি বস্তুর গতি কমাতে অথবা বাড়াতে পারবে, এমনকি একটি বুলেটেরও। তোমাকে যা করতে হবে তা হলো এর পথে একটি বালুর বাক্স বসিয়ে দেওয়া। বাক্সটিকে ভেদ করার সময় বুলেটটি তার বেগ হারাবে।

আলোর ব্যাপারে পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। বুলেটের গতি ব্যাপকভাবে বন্দুকের নকশার ওপর নির্ভরশীল। কারণ এটা দিয়েই বুলেটটি ছোড়া হয়। গান পাউডারের উপাদানের উপরও নির্ভরশীল। অথচ আলোর গতি সবসময় একই থাকে। এর উৎস যা-ই হোক না কেন।

আলোক রশ্মির পথে একটা কাচের প্লেট স্থাপন করে দেখি যেহেতু আলোর গতি শূন্য স্থানের চাইতে কাচের মাধ্যমে কম, রশ্মিটি কিছুটা ধীরে যাবে। তারপরও কাচ অতিক্রম করে গেলে আলো আবার সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার গতি অর্জন করবে।

শূন্যস্থানে আলোর বিস্তার অন্য সব গতির চাইতে স্বতন্ত্র। এর খুব আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে—এটির গতি না বাড়তে পারে, না কমতে পারে বস্তু মাধ্যমে আলোক রশ্মির যে-ধরনের পরিবর্তনই ঘটুক না কেন আবার শূন্যস্থানে নিক্ষিপ্ত হলেই আগের মতোই আলোক রশ্মির বিস্তার একই গতিতে হয়।

আলো এবং শব্দ।

আলোর বিস্তার প্রসঙ্গ আসলে বস্তুর সাধারণ গতির চাইতে শব্দের বিস্তারকেই বেশি মনে করিয়ে দেয়। শব্দ হচ্ছে কোন মাধ্যমের কম্পন যার মধ্য দিয়ে এটি সঞ্চারিত

হয়। তাই শব্দের গতি আসলে মাধ্যমের উপাদানের উপর নির্ভর করে, শব্দ-উৎপাদক বস্তুর উপাদানের উপর নয়। শব্দের গতি অন্য বস্তুগুলোর মধ্য দিয়ে চললেও আলোর গতিবেগের চাইতে বেশি বাড়তে পারে না। আমরা যদি বাধা সৃষ্টির জন্য কোনো ধাতুবস্তু শব্দের পথে রাখি, শব্দ সেই বাধার মধ্যেই তার গতিবেগ পরিবর্তন করবে। কিন্তু যখনই এটি আগের মাধ্যমে আবার ফিরে আসবে, আগের বেগও তখন আবার ফিরে পাবে। কোনো কাচের বাক্সে একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব ও বৈদ্যুতিক ঘণ্টা রাখি এরপর বায়ু পাম্পের সাহায্যে কাচের বাক্স থেকে বাতাস বের করতে থাকলে দেখবো, ক্রমেই শব্দ অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। একসময় আমরা আর ঘন্টার শব্দ শুনতে পাব না। অর্থাৎ ঘণ্টার আওয়াজও ক্রমাগত ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাবে এবং তারপর হারিয়ে যাবে অন্যদিকে বাল্বটি স্বাভাবিকভাবে আলো বিকিরণ করতেই থাকবে

এই পরীক্ষা প্রমাণ করে যে, শব্দ শূন্যস্থানের মধ্যদিয়ে সঞ্চালিত হতে পারে না, এর বিস্তারে মাধ্যম বা পদার্থের প্রয়োজন আর আলো শূন্যস্থানের মধ্য দিয়েও সঞ্চালিত হতে পারে। এখানেই তাদের মধ্যকার মৌলিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গতির আপেক্ষিকতার নীতি বিভ্রান্তির জালে

শূন্যস্থানে আলোর গতি প্রচণ্ড কিন্তু অসীম নয়। এটা আমাদেরকে গতির আপেক্ষিকতার নীতির সাথে দ্বন্দ্বে নিয়ে যায়। কল্পনা করি যে, একটি ট্রেন সেকেন্ডে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটারের তীব্র গতিতে এগিয়ে চলছে। আমরা সামনের দিকের কামরাতে চড়েছি শেষের দিকের কামরাটিতে একটি বৈদ্যুতিক বাল্ব জ্বালানো হলো এবার যদি ট্রেনের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে আলোর ভ্রমণের প্রয়োজনীয় সময় মাপতে যাই তাহলে কী ফলাফল আমরা পাব?

মনে হতে পারে এই ক্ষেত্রে ট্রেন থেমে থাকাকালীন সময় আমরা যা পেয়েছিলাম তা থেকে ভিন্ন ফল পাবো। বস্তুত সেকেন্ডে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার বেগে চলন্ত ট্রেনে আলোর আপেক্ষিক গতিবেগ হওয়া উচিত সেকেন্ডে মাত্র ৩০০,০০০ - ২৪০,০০০ = ৬০,০০০ বা ৬০ হাজার কিলোমিটার যখন আলো পিছন থেকে শুরুর দিকের কামরাটিতে আসবে। আমরা বাল্বটি ট্রেনের প্রথম দিকে

রাখলে কামরার শেষে পৌঁছতে কতটুকু সময় লাগবে? হিসাব বলে আলোর গতি যেহেতু ট্রেনের গতির উল্টো দিকে চলবে, তাই সেকেন্ডে ২৪০,০০০ + ৩০০,০০০ = ৫৪০,০০০ বা ৫ লক্ষ চল্লিশ হাজার কিলোমিটার গতিতে চলবে। যেহেতু আলো এবং কামরার শেষের দিক একে অন্যের দিকে ধাবিত হয়।

এভাবে মনে হতে পারে, চলন্ত ট্রেনে আলোর বিস্তার বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন গতিতে ধাবিত হয় অথচ একটি স্থির ট্রেনে আলোর গতি উভয় দিকে একই থাকে।

বুলেটের সঙ্গে এর অনেক পার্থক্য রয়েছে। ট্রেনের চলার পথের দিকে অথবা এর বিপরীত যে দিকেই গুলি ছোড়া হোক না কেন, বুলেটের গতি বাহনের দেয়ালের সঙ্গে আপেক্ষিক অবস্থায় একই থাকবে, আর থেমে থাকা ট্রেনের বুলেটের গতিও সমান হবে। এ বিষয়টা হচ্ছে যে, বুলেটের গতিবেগ রাইফেলের গতির ওপর নির্ভর করে। অথচ আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, উৎস তথা বাল্বটি যে গতিতেই ভ্রমণ করুক না কেন, আলোর গতিবেগের পরিবর্তন হয় না।

আমাদের যুক্তিতর্ক প্রতিপাদন করে যে, আলোর বিস্তার সুস্পষ্টভাবে গতির আপেক্ষিকতার নীতির বিপরীত। একটি বুলেট চলন্ত ট্রেন ও থেমে থাকা ট্রেনে এক রকমভাবে এবং একই গতিবেগে উড়ে চলবে। অথচ প্রতি সেকেন্ডে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার গতিতে চলা ট্রেনে আলো দৃশ্যত পাঁচগুণ ধীরে একটি দিকে ছড়াবে এবং আরেক দিকে স্থির হয়ে থাকা ট্রেনের তুলনায় ১.৮ গুণ বেশি দ্রুত ছড়াবে।

মনে হতে পারে যে, আলোক সঞ্চালনের সাহায্যে আমরা একটি চলন্ত ট্রেনের পরম গতি বের করতে সক্ষম হবো।

আশা আছে যে, আলোর বিস্তার বা সঞ্চালন প্রতিভাসের মাধ্যমে আমরা পরম স্থির ধারণা প্রতিষ্ঠিত করতে পারব।

যে কাঠামোর মধ্যে আলো সব দিকেই এবং অবিরাম সেকেন্ডে একই ৩০০,০০০ বা ৩ লক্ষ কিলোমিটার বেগে বিস্তার পায়, একেই পরম স্থির অবস্থা বলা যেতে পারে। অন্য কাঠামোগুলো প্রথমটির সাপেক্ষে আপেক্ষিক বেগে একই গতিতে নির্দিষ্ট দিকে চলে তখন আলোর গতিবেগ বিভিন্ন দিকে ভিন্ন ভিন্নই হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে গতির আপেক্ষিকতা, বেগের আপেক্ষিকতা এবং স্থির অবস্থার আপেক্ষিকতা, যা উপরে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছি, তার অস্তিত্ব থাকবে না

মহাশূন্যে ইথার (আলোক তরঙ্গ প্রেরণের মাধ্যম)

কীভাবে একে কল্পনা করা হলো? এক সময় পদার্থবিদরা শব্দ ও আলোক সঞ্চালন ধারণার মধ্যকার সাদৃশ করার জন্য একটি বিশেষ মাধ্যমের কল্পনা করেছিলেন। এই মাধ্যমকে তারা 'ইথার' বলে অভিহিত করেছেন। বাতাসের মধ্যে শব্দ যেভাবে ভেসে বেড়ায় আলোও একইভাবে সঞ্চারণ করে বলে তারা ভেবেছিলেন তারা ধারণা করেছিলেন যে, সরু কাঠের পাতে তৈরি পানিতে ভাসমান বাক্সের পানিকে ধাক্কা দেওয়ার চাইতেও কম ধাক্কা দেয় ইথারের মধ্যেদিয়ে চলাচলরত বস্তুগুলো।

যদি আমাদের ট্রেনটি ইথারের সাপেক্ষে নিশ্চল হয় তাহলে সবদিকে একই গতিবেগে আলো বিস্তারলাভ করতে পারবে। ইথারের সাপেক্ষে ট্রেনের গতি নিজেই হঠাৎ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করবে যে, আলোর গতিবেগ বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন রকম হবে।

তারপরও ইথারের মতো এমন একটি মাধ্যম যার কম্পন আমাদের কাছে আলো বলে প্রতীয়মান হয়। তবে তত্ত্বে ইথারের অন্তর্ভুক্তি বেশকিছু প্রশ্নের অবতারণা করে। প্রথমত ইথারের ধারণাটিই কৃত্রিম। বস্তুত, আমরা বাতাসের বৈশিষ্ট্যগুলো শুধু এর ভিতর শব্দের বিস্তার পর্যবেক্ষণ করেই নয় বরং গবেষণার বিভিন্ন ভৌত ও রাসায়নিক পদ্ধতির মাধ্যমেও নিরূপণ করতে পারি। অবশ্য যেন কিছু রহস্যময় কারণে ইথার বেশির ভাগ প্রতিভাসে কোনো অংশ নেয় না সূক্ষ্মতম পদ্ধতিগুলো দিয়েও বাতাসের ঘনত্ব এবং চাপ সহজেই মাপা যায়। যদিও ইথারের ঘনত্ব এবং অস্তিত্ব খোঁজার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

অবস্থানটি বড়ই হাস্যকর

প্রকৃতির সব প্রতিভাসকে বিশেষ কিছু উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যের তরল আনয়নের মাধ্যমে অবশ্যই ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। কিন্তু একটি প্রতিভাসের খাঁটি তত্ত্ব বা কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার সঠিক তত্ত্ব এবং ওই ঘটনার বিজ্ঞানসম্মত বর্ণনার মধ্যে মূল পার্থক্যই হলো যে, প্রথমটি থেকে এমন অনেক তত্ত্ব আহরণ সম্ভব যা দ্বিতীয়টি থেকে কখনোই করা যায় না। উদাহরণ হিসেবে পরমাণুর ধারণা নেওয়া যায়। এই ধারণা রসায়নশাস্ত্রের মাধ্যমে বিজ্ঞানে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু পরমাণু সম্বন্ধে ধারণা আমাদের এমন অসংখ্য প্রতিভাসের ব্যাখ্যা ও ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানে সক্ষম হয়েছে যাদের সঙ্গে রসায়নের কোনো সম্পর্ক নেই।

ইথারের ধারণাকে ঠিকমতো তুলনা করা যেতে পারে একজন আদি মানুষের (Savage) ব্যাখ্যার সঙ্গে—যে গ্রামোফোনকে একটি বিশেষ 'গ্রামোফোন আত্মার (gramophone sprite)' রহস্যময় বাক্সে আটকে থাকার ফল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে।

এই ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ আসলে কিছুই ব্যাখ্যা করে না।

পদার্থবিজ্ঞানীদের ওই ধরনের দুর্ভাগ্যের অভিজ্ঞতা হয়েছিল ইথার নিয়ে কাজ করার আগেই। এক সময় তারা দহন প্রতিভাসের ব্যাখ্যা করেছিলেন বিশেষ তরলের উপাদান দিয়ে—একে তারা বলছিলেন ফ্লোজিস্টন (flogiston) আর তাপের ঘটনা অন্য তরলের বৈশিষ্টগুলো দিয়ে— যার নাম হেটেরোড (hetorode)। এই তরলগুলো যা-ই হোক লুকোচুরিতে ইথারের চেয়ে কোনো অংশে কম যায় না।

উল্লেখ্য কোন পদার্থে ফ্লোজিস্টন উপস্থিত থাকলেই কেবল সেগুলি জ্বলতে পারে। কোনো পদার্থে যতবেশি পরিমাণ ফ্লোজিস্টন থাকবে সেটি ততই সক্রিয়ভাবে জ্বলবে কয়লা হলো প্রায় বিশুদ্ধ ফ্লোজিস্টনের উদাহরণ। ভস্মীকরণ ধাতুগুলো হারিয়ে মৃত্তিকায় পরিণত হয়।

জটিল পরিস্থিতি

কিন্তু প্রধান সমস্যাটি হচ্ছে ওই সত্যটিকে ঘিরেই যে আলোক সঞ্চারণ গতির আপেক্ষিক নীতিকে লঙ্ঘন করে। যে সমস্যার কারণে অন্যান্য বস্তুর বেলায়ও একই নীতির লঙ্ঘন অপরিহার্যভাবে সৃষ্টি হবে।

সর্বোপরি, যেকোনো মাধ্যম বস্তুর গতিকে বাধা দিয়ে থাকে। তাই, ইথারে বস্তুর সরনে ঘর্ষণ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। ফলে কোনো বস্তুর চলাফেরা— ক্রমশ ধীর হয়ে শেষ পর্যন্ত এটার থেমে যাওয়া অবস্থায় আসা উচিত। ইতিমধ্যে, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে কয়েকশ কোটি বছর ধরে (ভূ-তাত্ত্বিক তথ্য অনুযায়ী) এবং ঘর্ষণের কারণে তা ধীর হয়ে যাওয়ার কোনো চিহ্ন দেখায় নি।

এভাবে, ইথারের উপস্থিতিতে কোনো চলন্ত ট্রেনের বরাবর আলোর অদ্ভুত আচরণকে ব্যখ্যার চেষ্টার কারণে আমরা একটি কানা গলিতে হোঁচট খেয়েছি মাত্র। আসলে আলোর আপেক্ষিক নীতির লঙ্ঘন এবং অন্য সব গতির পর্যবেক্ষণের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ইথারের ধারণা দিয়ে দূর করা যায় না।

পরীক্ষণেই নিষ্পত্তি হওয়া উচিত

এই প্রতি বিপরীত ধারণা দিয়ে কী করা হবে? এই বিবেচনায় আমাদের কণ্ঠ জাগ্রত করার আগে নিচের অবস্থার দিকে তাকানো যাক।

আলোর বিস্তার এবং গতির আপেক্ষিকতার মধ্যকার দ্বন্দ্ব একান্তই একটি মানসিক গঠনের মধ্য দিয়ে আমাদের সামনে উঠে এসেছে।

এই মানসিক গঠন অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে আমাদের সামনে প্রতীয়মান। কিন্তু আমরা যদি নিজেদের শুধুমাত্র যুক্তির কাছে সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে একজন প্রাচীন দার্শনিকের অবস্থায় পড়বো, যিনি কেবলমাত্র যুক্তির ওপর ভিত্তি করে নতুন একটি বাহ্যজগৎ তৈরি করতে গিয়ে এমন এক জগৎ নির্মাণ করলেন যার সাথে সত্যিকার জগতের কোনো মিলই নেই। পৃথিবীকে বোঝা আরও জটিল হয়ে পড়ে।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা হলো সবকিছুর এবং প্রত্যেকটি ভৌত তত্ত্বের সবচেয়ে বড়ো বিচারক। অতএব চলন্ত ট্রেনের মধ্যে কিভাবে আলো বিস্তারলাভ করে নিজেদেরকে সেই যুক্তিতর্কে সীমাবদ্ধ না রেখে, আমরা বিষয়টাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে দেখতে পারি সত্যিকারভাবে আলো এরকম একটি অবস্থায় কিভাবে বিস্তারলাভ করে।

আমরা যে নিজেরাই একটি চলন্ত বস্তুর উপরে আছি তা এই পরীক্ষণের একটি বড়ো সুবিধা। সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণনরত পৃথিবী সরলরেখা বরাবর চলে না এবং যেকোনো কাঠামোর সাপেক্ষে কোনোভাবেই স্থায়ীভাবে স্থির নয়।

এমনকি আমরা যদি এরকম কাঠামো ধরে নেই যার সাপেক্ষে জানুয়ারিতে পৃথিবী গতিহীন। তবে এটা নিশ্চিত যে জুলাইতে এটা আবার গতিশীল হবে যেহেতু সূর্যের চারিদিকে পৃথিবীর ঘূর্ণনে দিক পরিবর্তন হয়। সেই কারণে পৃথিবীর উপর আলোক বিস্তারের গবেষণাটিকে বলা যেতে পারে—এমন একটি কাঠামোর মধ্যে পর্যবেক্ষণ করি যা সেকেন্ডে ৩০ কিলোমিটার দ্রুতিতে গতিশীল। আমাদের

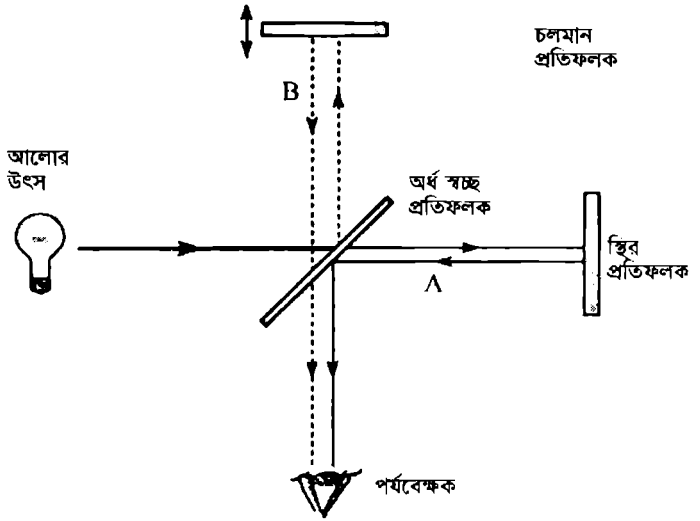

মাইকেলসন মর্লি ইন্টারফেরোমিটার : ইথারের কারণে দুই বিপরীত দিকে ছয়মাস সময়ান্তরে সমকোণে ভ্রমণশীল দুইটি আলোক রশ্মির পরস্পরের সাথে বেগের যে অতি অল্প পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারতো, তার চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র পার্থক্য এই যন্ত্রে শনাক্তযোগ্য।

পরিস্থিতিতে সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য। পৃথিবীর তার নিজের অক্ষের চারিদিকে প্রতি সেকেন্ডে অর্ধ কিলোমিটার মাত্রায় ঘূর্ণনকে অবজ্ঞা করা যেতে পারে

উপরের আলোচিত পৃথিবীর সঙ্গে চলন্ত ট্রেনের তুলনা কি যুক্তিযুক্ত হবে যা আমাদের একটি কানা গলিতে ঠেলে দিয়েছিল? ট্রেনটি সরলরেখা বরাবর সমবেগে গতিশীল, অথচ পৃথিবীর গতি কক্ষপথীয়। হ্যাঁ আমাদের এমনটি করা যুক্তিসংগত হবে কারণ এক সেকেন্ডের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ভগ্নাংশে পৃথিবীকে ভালোভাবেই সরলরেখা বরাবর সমবেগে গতিশীল হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। ওই সময়ের মধ্যে আলো পর্যবেক্ষণের স্থানটি অতিক্রম করে যেতে পারে। ত্রুটির মাত্রা এত বেশি অতাৎপর্যপূর্ণ যে এটা চিহ্নিত করা যায় না।

কিন্তু যেহেতু আমরা রেলওয়ে ট্রেন এবং পৃথিবীকে তুলনা করেছি : স্বাভাবিকভাবে এটা আশা করা যায় যে, পৃথিবীর উপর আলো যে আচরণ করবে ঠিক সেরকমই ট্রেনের ভিতরে করবে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত একে বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন গতিবেগ সম্পন্ন হিসেবে দেখা যাবে।

আপেক্ষিক তত্ত্বের বিজয়

এই ধরনের পরীক্ষা ১৮৮১ সালের দিকে অ্যালবার্ট মাইকেলসন করেছিলেন। তিনি উনিশ শতকের সবচেয়ে বড় মাপের পরীক্ষণবিদদের একজন ছিলেন, যিনি

উচ্চমানের শুদ্ধতা নিয়ে আলোর গতিবেগ বিভিন্ন দিকে পরিমাপ করেছিলেন। গতিবেগে প্রত্যাশিত সামান্য পার্থক্য শনাক্ত করার জন্য মাইকেলসন সূক্ষ্ম এবং অতি উন্নত পরীক্ষণ যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিলেন। তার গবেষণার সূক্ষ্মতা ছিল অনেক উচ্চ পর্যায়ের। ইথারের কারণে দুই বিপরীত দিকে ছয়মাস সময়ান্তরে সমকোণে ভ্রমণশীল দুইটি আলোক রশ্মির পরস্পরের সাথে বেগের যে অতি অল্প পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারতো, তাঁর চেয়েও অনেক ক্ষুদ্র পার্থক্য তাঁর যন্ত্রে শনাক্তযোগ্য। এ কারণে তিনি প্রত্যাশার চেয়েও কম পার্থক্য শনাক্ত করতে সামর্থ্য ছিলেন।

মাইকেলসন পরীক্ষাটি পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছিল এবং তা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ফলাফলের দিকে নিয়ে গিয়েছিল। একটি চলন্ত কাঠামোতে আমরা যেমনটা অনুমান করি তার চাইতে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে আলোর বিস্তার ঘটে। মাইকেলসন আবিষ্কার করেছিলেন যে, ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর উপর আলো অবিরাম একই গতিবেগে সবদিকে পরিভ্রমণ করে। এই সাপেক্ষে, আলোর বিস্তার উড়ন্ত বুলেটের কথা আমাদের মনে করিয়ে দেয়: এটা কাঠামোর উপর নির্ভশীল নয়, আর এর গতিবেগ কাঠামোর দেয়ালের সাপেক্ষে সবদিকে একই রকম।

মাইকেলসনের পরীক্ষা এভাবে আলোর বিস্তার বা সঞ্চালনের প্রতিভাসে আমাদের অনুমানের বিপরীত ধারণা প্রমাণ করেছিল, বৈপরিত্য থেকে দূরে নয় বরং গতির আপেক্ষিকতার নীতির সঙ্গে পুরোপুরি একমত। অন্য কথায়, পূর্বের সকল যুক্তি আমাদের শেষ পর্যন্ত ভুল প্রমাণের দিকে গেছে।

ফুটন্ত কড়াই থেকে উনুনে

আলোর বিস্তারের আইন এবং গতির আপেক্ষিক নীতির মধ্যকার অস্বস্তিকর বৈপরীত্য আমরা বাদ দিয়েছি। এই বৈপরীত্য কেবল দেখা গিয়েছিল আমাদের ভ্রান্ত যুক্তির কারণে। কেন আমরা এই ধরনের ভুল সৃষ্টি করেছিলাম?

কোনো কিছুর সাপেক্ষে ছাড়া মহাশূন্যে কে স্থির কে গতিশীল তা বোঝার উপায় নেই

১৮৮১ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এক শতকের চতুর্থাংশের কাছাকাছি সময়ের মধ্যে পদার্থবিদরা এই সমস্যা নিয়ে মাথা খাটিয়েছেন। তারপরও তাদের সব ব্যাখ্যা অপ্রতিরোধ্যভাবে তত্ত্ব ও অনুশীলনের মধ্যকার নতুন বৈপরীত্যের দিকে নিয়ে গেছে।

যদি শব্দের উৎস এবং পর্যবেক্ষক পাতলা রডের তৈরি একটি খাঁচায় ভ্রমণ করে তাহলে পর্যবেক্ষক প্রচণ্ড বাতাস অনুভব করবে যদি আমরা খাঁচার সাপেক্ষে শব্দের গতিবেগ পরিমাপ করি, তাহলে উল্টোদিকের চেয়ে খাঁচার দিকের গতি কম হবে। তবুও মনে করি, আমরা শব্দের উৎসকে বহনকারী কামরাকে এমন এক জায়গায় স্থাপন করি যার সব জানালা ও দরজা শক্তভাবে বন্ধ। এরপর এর গতিবেগ পরিমাপ করি। আমরা আবিষ্কার করবো যেহেতু গাড়ির চলা-ফেরায় গাড়িটির ভেতরে বাতাস কোনো প্রতিক্রিয়া ফেলতে পারছে না, ফলে এর শব্দের গতি সবদিকেই সমান হবে।

যদি আমরা শব্দের পরিবর্তে আলো নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করি। তাহলে আমরা মাইকেলসনের পরীক্ষাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নিচের ধারণাটি তৈরি করতে পারি। স্থানের মধ্যদিয়ে প্রচণ্ড গতিতে চলন্ত পাতলা রডের তৈরি খাচার মতোই পৃথিবী ইথারকে কখনই আন্দোলিত করা ছাড়া ত্যাগ করে না। বিপরীতে, আমরা চিন্তা করি যে, পৃথিবী ইথারকে বহন করে এবং চলার সময় ইথারের সঙ্গে মিলে পুরো এক হয়ে যায়। ওই ক্ষেত্রে মাইকেলসনের গবেষণার ফল পুরোপুরি বোঝা যাবে।

কিন্তু এ ধারণা অনেক বেশি সংখ্যক অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার সঙ্গে দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। যেমন একটি নলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত পানিতে আলোর বিস্তার। যদি পৃথিবীর সঙ্গে বাহিত হওয়া ইথার সম্পর্কে আমাদের ধারণা সঠিক হয়ে থাকে, তাহলে আলোর গতিবেগ পানি প্রবাহের দিকে মেপে আমরা একটি গতিবেগ পাব, যা নিশ্চল পানিতে আলোর গতিবেগ এবং পানি প্রবাহের যোগফলের সমান। কিন্তু আমাদের মাপজোকের ফল অনুযায়ী ধারণা সঠিক হলে যেমনটি আমাদের পাওয়া উচিত তার চেয়ে আমরা কম গতিবেগ পাই।

আমরা ইতিমধ্যে বস্তুর অদ্ভুত প্রতিভাস উল্লেখ করেছি, ইথারের মধ্যদিয়ে চলার সময় বলতে গেলে কোনো ঘর্ষণের অভিজ্ঞতা ঘটে না। কিন্তু তারা শুধু ইথারের মধ্য দিয়ে যায়ই না, বরং ইথারকে বহন করে তাহলে বড়ো রকমের ঘর্ষণ ঘটবে। এভাবে মাইকেলসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপ্রত্যাশিত ফলাফলের পর উদ্ভব হওয়া বৈপরীত্যকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছিল।

এবার আমরা সারসংক্ষেপ করি

মাইকেলসনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা পুনরায় নিশ্চিত করে গতির আপেক্ষিক নীতিকে, শুধু সাধারণ বস্তুগুলোর জন্য নয় বরং আলোর বিস্তারের জন্যও সঠিক মূলত এ কারণেই সব প্রাকৃতিক প্রতিভাসের জন্য সত্যি।

আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, বেগের আপেক্ষিকতা সরাসরি এসেছে গতির আপেক্ষিকতার নীতি থেকে। পরস্পরের সাপেক্ষে চলমান ভিন্ন ভিন্ন কাঠামোর ভিন্ন ভিন্ন দ্রুতি থাকা উচিত। কিন্তু অন্যদিকে আলোর গতিবেগ সেকেন্ডে ৩ লাখ কিলোমিটার সব কাঠামোর জন্য একই। তাই এটি আপেক্ষিক নয় বরং পরম!

চতুর্থ অধ্যায় ‖ আপেক্ষিক সময়

সত্যিই কোনো বৈপরীত্য রয়েছে?

প্রথম দৃষ্টিতে এটা মনে হতে পারে যে, আমরা আসলে যৌক্তিক বৈপরীত্য নিয়ে আলোচনা করছি। সব দিকে আলোর বিস্তারের ধ্রুব গতিবেগ আপেক্ষিক নীতির বড়সড় প্রমাণ। আবার একই সময়ে গতিবেগ নিজেই পরম

তবুও আমরা স্মরণ করি, কিভাবে মধ্যযুগীয় মানুষ পৃথিবীটা গোলাকার তা আলোচনা করত। তার কাছে পৃথিবীর গোলাকারিত্ব মহাকর্ষবলের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছিল। যেহেতু সে ভাবতো যে সব বস্তুর পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে গড়িয়ে পড়ার কথা এর ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। এখন অবশ্য আমরা নিখুঁতভাবে জানি যে, এখানে আদৌ কোনো যৌক্তিক দ্বন্দ্ব নেই। সাধারণভাবে 'উপর' এবং 'নিচের' ধারণা আপেক্ষিক পরম নয়।

আলোর বিস্তারের ক্ষেত্রও একই সত্য ধারণ করে থাকে।

গতির আপেক্ষিক নীতি এবং আলোর গতিবেগের পরমত্বের মধ্যে যৌক্তিক বৈপরীত্যের অনুসন্ধান তুচ্ছ মনে হতে পারে। আসলে অন্য ধারণাগুলোর সাথে আমাদের পরিচয় ঘটার সময় এই বৈপরীত্য উপস্থিত হয়। এগুলোর বেশিরভাগই মধ্যযুগের মানুষদের পথ বেয়ে আসা চিন্তাধারা যে চিন্তাধারায় পৃথিবী পরমভাবে 'উপর এবং নিচ'-এর বিশ্বাস দ্বারা ঘেরা ছিল তা তারা খন্ডন করেছিল। অপর্যাপ্ত গবেষণা থেকে তাদের উদ্ভট বিশ্বাসের সূচনা হয়েছিল ওই সময় মানুষ ভ্রমণ করত কম এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের ছোট ছোট অঞ্চলগুলো সম্পর্কেই কেবল জানত স্পষ্টত, কিছুটা একইরকম ব্যাপার ঘটেছে আমাদের ক্ষেত্রে : অপর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা আপেক্ষিক কিছুকে পরম বলে বিশ্বাস করতে আমাদের শিখিয়েছে।

তাই যদি হয়?

তাহলে এখন থেকে আমাদের ভুলকে চিহ্নিত করতে গবেষণার ওপর নির্ভর করার নীতি ছাড়া কিছুই গ্রহণ করব না।

ট্রেনে চড়া

কল্পনা করি, ৫৪ লক্ষ কিলোমিটার লম্বা একটি ট্রেন। ট্রেনটি সেকেন্ডে ২ লাখ ৪০ হাজার কিলোমিটার সমবেগে সরলরেখা বরাবর চলছে।

ধরি, ট্রেনটির মাঝখানের কোনো জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ে তাৎক্ষণিকভাবে একটি বাতির সুইচ অন করা হলো। মনে করি, বাল্বের আলো তাদের কাছে পৌঁছনোর মুহূর্তেই বাহনের সামনের এবং পেছনের দরজা স্বয়ংক্রিয়ভাবে খুলে যাবে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ট্রেনে যারা চড়েছে তারা এবং স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যারা দাঁড়ানো তারা কী ঠিক একই ঘটনা একই সময়ে ঘটতে দেখবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে আমরা আগের প্রস্তাব অনুযায়ী পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত উপাত্ত মনেপ্রাণে মেনে চলব।

চলমান ট্রেনে মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাত্রীরা দেখতে পাবে : যেহেতু মাইকেলসনের পরীক্ষণ অনুযায়ী আলো ট্রেনের সাপেক্ষে একই গতিবেগে সব দিক ভ্রমণ করে - ৩ লক্ষ কিলোমিটার গতিবেগে, এটি গাড়ির পেছনের এবং সামনের দিকে একই সময় পৌঁছবে। উভয়ই দরজা ৯ সেকেন্ড $\left\{\frac{(৫৪০০০০০ \text{ লাখ কিমি} \div ২)}{৩০০,০০০ \text{ কিমি/সে}} = \frac{২,৭০০,০০০ \text{ কিমি}}{৩০০,০০০ \text{ কিমি/সে}}\right\}$ পরে একই সাথে খুলবে।

স্টেশন প্লাটফর্মের সাপেক্ষেও আলো সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটার গতিতে ভ্রমণ করে, কিন্তু পেছনের বগিও আলোক রশ্মির দেখা পাওয়ার উদ্দেশ্যে ছুটছে, তাই আলোক রশ্মি পেছনের বগিতে পৌঁছবে $\frac{২,৭০০,০০০}{৩০০,০০০+২৪০,০০০}$ বা ৫ সেকেন্ড পর। সামনের বগিকেও আলোক রশ্মি অবশ্যই ধরে ফেলবে তবে এটি পৌঁছবে বেশি সময় পরে অর্থাৎ ৪৫ সেকেন্ড পর $\frac{২,৭০০০০০ \text{ কিমি}}{(৩০,০০০-২৪০,০০০) \text{ কিমি/সে}} = \frac{২,৭০০০০০ \text{ কিমি}}{৬০,০০০ \text{কিমি/সে}}$।

প্লাটফর্মে দাঁড়ানো লোকদের মনে হবে যে দরজা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে খোলা হয়েছে, পেছনের দরজা প্রথমে এবং সামনের দরজা তার ৪০ সেকেন্ড পরে

এভাবে ট্রেনের পেছনের এবং সামনের দরজা খোলা—দুটি প্রকৃতই এক ঘটনা। ট্রেনে চড়া মানুষদের জন্য ঘটবে একই সময়ে এবং প্লাটফর্মের দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের জন্য ৪০ সেকেন্ডের বিরতিসহ!

সাধারণ জ্ঞানের বিপরীত?

এতে কোনো বৈপরীত্য রয়েছে? সম্ভবত আমরা যে সত্যটি আবিষ্কার করেছি তা একটি কুমিরের মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত দুই মিটার এবং লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত এক মিটার পরিমাপ করে বলার মতোই উদ্ভট

পরীক্ষণের মাধ্যমে এটি নিশ্চিত করা সত্ত্বেও যে ফলাফল আমরা পেয়েছি তা উদ্ভট হওয়ার কারণ আমরা বোঝার চেষ্টা করে দেখি।

আমাদের চিন্তনধারা অনুসারে বিষয়টি কঠিন। আমরা এ বিষয়ে কখনোই কোনো যৌক্তিক বৈপরীত্য খুঁজে পাব না যে, দুটি ঘটনা যা যুগপৎ ঘটবে ট্রেনের লোকদের জন্য আর প্লাটফর্মের লোকদের জন্য ৪০ সেকেন্ড পরে।

আমাদের সিদ্ধান্ত সাধারণ জ্ঞানের চরম বিপরীত, যা শুধু নিজেদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বলতে পারি।

কিন্তু স্মরণ কর, কীভাবে মধ্যযুগে মানুষ 'পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে' এ মতবাদের বিরুদ্ধচারণ করেছিল। বস্তুত মধ্যযুগীয় মানুষের অভিজ্ঞতা অবিসংবাদিতভাবে বলেছিল, পৃথিবী স্থির অবস্থায় আছে এবং সূর্য এর চারপাশে ঘূর্ণনরত। আর এটা কি সাধারণ জ্ঞান নয় যে, পৃথিবী গোল হতে পারবে না। অথচ এটা এখন হাস্যকর। বাস্তবতার সঙ্গে সাধারণ জ্ঞানের দ্বন্দ্বকে উপহাস করা হয়েছে একজন রাখাল সম্পর্কে সুবিদিত কৌতুকে : যখন চিড়িয়াখানায় রাখালটি একটি জিরাফ দেখল তখন আশ্চর্য হয়ে বলেছিল— 'এটা হতে পারে না।'

তথাকথিত সাধারণ জ্ঞান প্রাত্যহিক জীবনে গড়ে ওঠা ধারণা ও অভ্যাসের সারসংক্ষেপের চেয়ে অধিক কিছুই না। এটি আমাদের অভিজ্ঞতার ব্যাপ্তিকে প্রতিফলন করে এবং উপলব্ধি বা চেতনার একটি নির্দিষ্ট স্তরকে উপস্থাপন করে।

ট্রেনে দুটি ঘটনা যুগপৎ ঘটা এবং প্ল্যাটফর্ম থেকে ৪০ সেকেন্ড বিরতিতে দেখতে পাওয়ার ঘটনা বোঝার ও উপলব্ধির জটিলতা হলো অনেকটা রাখালের জিরাফ দেখার সময়ের মতোই কঠিন। যে রাখাল কখনোই জিরাফ দেখেনি তার মতোই আমরাও কোনো স্থানে সেকেন্ডে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটারের দারুণ গতির কাছাকাছি গতিতে কখনো ভ্রমণ করিনি। পদার্থবিদদের কাছে এটা বিস্ময়ের ব্যাপার নয়! এর কারণ এই যে, তারা এমন চমৎকার গতির মুখোমুখি হয়েছেন এবং তারা সত্যগুলো

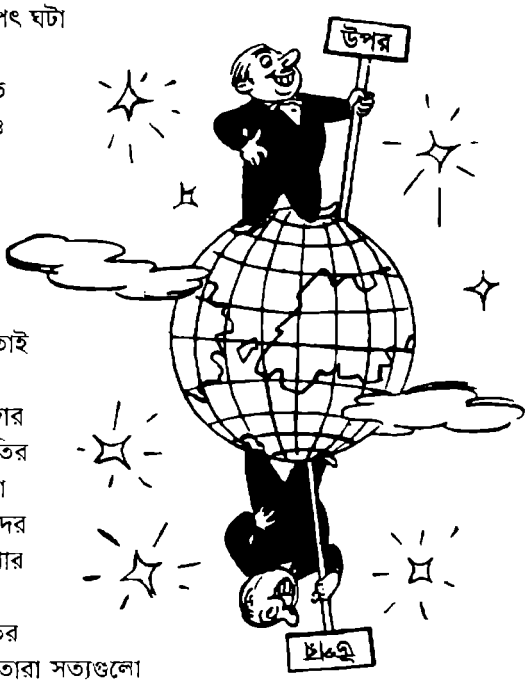

পর্যবেক্ষণ করেছেন। ফলে প্রাত্যহিক জীবনে পর্যবেক্ষণ করা অভ্যস্ত ঘটনাগুলো থেকে এগুলো ভিন্ন ঘটনা তা বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করেন।

মাইকেলসনের গবেষণার অপ্রত্যাশিত ফলাফল পদার্থবিদদের নতুন বাস্তবতায় সুসজ্জিত করেছে এবং প্রচলিত ধারণায় যাচাইকৃত দুটো ঘটনার যুগপত্ততার মতো স্পষ্ট ও সাধারণ ঘটনাগুলোকে পুনরায় পর্যবেক্ষণে বাধ্য করেছে।

সাধারণ জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন ধারণা অস্বীকার করলে অবশ্যই এটি আরো সহজ হতো কিন্তু যদি আমরা তা করতাম, তাহলে আমরা রাখালের মতোই হয়ে যেতাম যে তার চোখকে বিশ্বাস করতে পারেনি, যখন সে একটি জিরাফ দেখেছিল।

স্থানের নিয়তিতে সময়ের অংশগ্রহণ

বিজ্ঞান তথাকথিত সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে দ্বন্দ্বে জড়াতে দ্বিধা করে না। বিজ্ঞান যা নিয়ে সবচেয়ে অস্বস্তিবোধ করে তা হচ্ছে প্রচলিত ধারণা এবং নতুন গবেষণা বা পর্যবেক্ষণের উপাত্তের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা। যদি তা কখনো ঘটে তবে বিজ্ঞান প্রচলিত ধারণা ভেঙে ফেলে আমাদের জ্ঞানকে উঁচু স্তরে উন্নীত করে।

আমরা ভাবতাম যে, দুটি যুগপৎ ঘটনা যেকোনো কাঠামোর জন্য যুগপৎ তবুও আমাদের পরীক্ষা প্রমাণ করে যে আমরা ভুল। এটি শুধু সেক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়, যখন কাঠামোগুলো পরস্পরের সঙ্গে স্থির অবস্থায় থাকে। অন্যদিকে যদি দুটি কাঠামো পরস্পরের সাপেক্ষে আপেক্ষিক গতি সম্পন্ন হয়, তাদের একটিতে যুগপৎ হলেও অন্যটিতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভূত হওয়া উচিত। যুগপৎ ধারণা আপেক্ষিকে পরিণত হয়; গতির কাঠামোকে সুনির্দিষ্ট করলে এই উপলব্ধি তৈরি হয় গতিশীল কাঠামোর সাপেক্ষে উদ্ভূত ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলেই এই পরিস্থিতি হয়

এর আগে প্রথম অধ্যায়ে দেওয়া কৌণিক দূরত্বের আপেক্ষিকতার উদাহরণ আমরা স্মরণ করি পৃথিবী থেকে পর্যবেক্ষণ করা হলে দুটি নক্ষত্রের মধ্যে কৌণিক

দূরত্ব শূন্য হবে, নক্ষত্র দুটি অনেক দূরত্বে হওয়ায় একরেখা মনে হয়। প্রাত্যহিক জীবনে আমরা কখনোই এ ধারণার সঙ্গে দ্বন্দ্বে যাব না যে, এটি একটি পরম সত্য। কিন্তু আমরা সৌরজগতের বাইরে গেলে এবং দুটি নক্ষত্রকে মহাশূন্যের অন্য স্থান থেকে পর্যবেক্ষণ করলে এটি ভিন্ন হবে। আমরা খুঁজে পাব যে কৌণিক দূরত্ব শূন্য থেকে বেশ আলাদা।

সমসাময়িকদের কাছে সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে, পৃথিবী থেকে দেখা দুটি নক্ষত্র একই রেখায় মনে হলেও মহাশূন্যের অন্য স্থান থেকে দেখলে তাদের একই রেখায় হয়তো প্রতীয়মান হবে না। এ ধারণা মধ্যযুগীয় মানুষদের কাছে খাপছাড়া মনে হতো। তারা হয়তো ধারণা করতো আকাশ হচ্ছে গম্বুজের মতো, যাতে নক্ষত্ররা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে।

সব ধরনের কাঠামো থেকে দূরে রেখে আমাদের জিজ্ঞেস করা হলে, ঘটনা দুটি সত্যিই একই সময়ে ঘটেছিল কী-না তা, আমাদের কাছে কোনো অর্থ বা উপলব্ধি দেবে না যেমন অর্থ দেবে না দুর্ভাগ্যজনকভাবে যদি পর্যবেক্ষণের অবস্থানগুলোকে প্রাসঙ্গিকতার মধ্যে না এনে দুটি নক্ষত্রকে সত্যিই একরেখায় দেখা যাবে কী-না এ প্রশ্নে বিষয়টি হলো যে, যুগপত্ততা শুধু দুটি ঘটনার ওপর নির্ভর করে না, বরং যে প্রসঙ্গ কাঠামো থেকে আমরা তাদের পর্যবেক্ষণ করি তার উপরও। ঠিক যেভাবে দুটি নক্ষত্রের একই সারিতে থাকা শুধু তাদের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে না বরং যে-স্থান থেকে দেখা হয় তার ওপরও নির্ভর করে

মানুষ আলোর গতিবেগের তুলনায় খুবই নগণ্য গতি নিয়ে আলোচনা বা কাজ করে। যুগপৎ ধারণার আপেক্ষিকতা তাদের কাছে অজানা ছিল শুধু আলোর সঙ্গে তুলনীয় গতিবেগের সময় আমাদের বাধ্য করেছিল যুগপৎ ধারণাকে পুনঃপরীক্ষা করতে

একইভাবে পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি দূরত্ব ভ্রমণের প্রারম্ভিক সময় থেকেই মানুষকে তার 'ওপর', 'নিচ' ইত্যাদি সম্বন্ধে ধারণা সংশোধন করতে হয়েছিল তার আগে, পৃথিবীর সমতল হওয়ার ধারণা নিয়ে মানুষকে তার নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে হয়েছে।

বাস্তবিকই, আমরা আলোর কাছাকাছি গতিবেগে ভ্রমণে সামর্থ্য নই। আমরা যেসব ঘটনাসমূহ (fact) আলোচনা করেছি তা পর্যবেক্ষণেও সক্ষম নই; যেগুলো পুরনো ধারণা থেকে থেকে দেখলে স্ববিরোধী মনে হয়। কিন্তু ধন্যবাদ আধুনিক পরীক্ষণ কৌশলকে, আমরা বেশ কিছুসংখ্যক ভৌত প্রতিভাসে এই বাস্তবতাগুলোকে দেখাতে সমর্থ হয়েছি অবশেষে।

সময় এভাবে স্থানের নিয়তিতে ভাগ বসায়। 'একটি এবং একই সময়' শব্দগুলো শুধু 'একটি এবং একই স্থানে' শব্দগুলোর মতোই অর্থহীন।

স্থানের মধ্যকার দূরত্বের মতোই দুটি ঘটনার মধ্যকার সময় বিরতিকেও একটি প্রসঙ্গ কাঠামোর সাপেক্ষে বিবেচনা করতে হবে যার মাধ্যমে ঘটনাটি নির্ধারিত হবে।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা

সময় আপেক্ষিক—এই আবিষ্কার প্রকৃতি সম্বন্ধে মানুষের ধারণা মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। শত শত বছরের পুরনো ধারণার ওপর মানুষের যুক্তির সবচেয়ে বড় বিজয়ের একটি হিসেবে এটিকে বিবেচনা করা হয়। এটি শুধুমাত্র মানুষের ধারণায় সংঘটিত ওই বিপ্লবাত্মক পরিবর্তনের সঙ্গে তুলনীয় যে 'পৃথিবী গোল' তার আবিষ্কার।

১৯০৫ সালে সময়ের আপেক্ষিকতার আবিস্কারটি করেছিলেন বিশ শতকের সবচেয়ে বড়ো পদার্থবিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন (১৮৮০-১৯৫৫)। এটি তাঁকে মানবচিন্তার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো দিকপাল কোপার্নিকাস, নিউটন এবং বিজ্ঞানের অন্যান্য মহারথীর কাতারে দাঁড় করিয়ে দেয়। অথচ সে সময় তিনি ছিলেন মাত্র ২৫ বছরের তরুণ। সমাজ বিপ্লবের যুগন্তকারী মানব ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন আলবার্ট আইনস্টাইনকে 'প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্যতম রূপান্তরকারী' বলে সম্বোধন করেছেন।

সময়ের আপেক্ষিক তত্ত্ব এবং এর অনুসিদ্ধান্তগুলো (corrollaries) বিশেষ আপেক্ষিক তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত। এটিকে গতির আপেক্ষিক নীতির সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

আলবার্ট আইনস্টাইনের জীবন গাথা

ইতালির 'প্যাভিয়ার'-এর দিকে চলে যাওয়া পথের প্রান্ত ধরে হেঁটে বেড়াত এক কিশোর। দীর্ঘকেশী এই কিশোরের কতই-বা বয়স? ষোল ঊর্ধ্বে সতের? উনিশ শতকের নব্বইয়ের দশকে তুসকান গ্রামের নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতে হেঁটে চলা কিশোরের চোখে-মুখে অপার বিস্ময়। বুদ্ধিদীপ্ত দু'চোখ নিরন্তর কি যেন খুঁজত। মাঝে মধ্যে উদভ্রান্তিও উঁকি দিত সে চোখে। হবেই-বা না কেন? তথাকথিত বিদ্যাপাঠের নিকুচি করা মনোভাব শৈশব থেকেই ভোগাচ্ছিল তাকে। জোরজবরদস্তি করে গিলতে থাকা পাঠ্যসূচি ক্রমেই তাকে বিরক্ত করে তুলছিল। কৈশোরে এ বিরক্তি চরমে ওঠে। প্রুশিয়ান স্কুলের শিক্ষকদের কাছে কিন্তু এ বিষয়ে কোনো যুক্তিতর্কই খাটল না।

অতএব, যা হওয়ার তাই হলো। স্কুলের বেঞ্চি, ব্ল্যাকবোর্ড আর নিয়মবাঁধা ঘণ্টা নির্বাসন দিল তাকে। আর এ পরিণতিকেই লুফে নিল লম্বা চুলের কিশোর। ভাবদর্শনের মৌলিকত্ব আর জগতের নিগূঢ় সত্য উপলব্ধি করার প্রয়াসে ঘুরে বেড়াতে লাগল তুসকানের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। কিন্তু কে এই বালক? শিক্ষকের মতে, 'বোকা একটি ছেলে। অমনোযোগী তো বটেই। তবে গাম্ভীর্যভরা ব্যক্তিত্ব দেখে' মায়ের মনে হতো, 'ছেলে আমার বড় হয়ে অধ্যাপক হবে।' মায়ের এ ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে হয়নি। ১৮৭৯ সালের ১৪ মার্চ জার্মানির উলম্ শহরে জন্ম নেওয়া এই বালক পরবর্তীকালে পদার্থবিজ্ঞান জগতে প্রতিভার প্রতিশব্দ হয়ে দাঁড়ায়। জার্মান বংশোদ্ভূত ইহুদি এ পদার্থবিজ্ঞানীর নাম আলবার্ট আইনস্টাইন।

আইনস্টাইন হচ্ছেন 'আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা'। আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রায় একশ' বছর এর মধ্যে পার হয়ে গেছে—এখনো আমরা সেই আইনস্টাইনীয় বিশ্বে বাস করছি

জর্জ বার্নার্ড শ', ১৯২৫ সালের নোবেল বিজয়ী সাহিত্যিক—শেক্সপিয়রের পর যাঁকে ব্রিটেনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাট্যকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়। পদার্থবিজ্ঞানে আইনস্টাইনের অবদানকে তুলে ধরতে গিয়ে শ' আইনস্টাইনের জীবনের নানা মজার মজার কাহিনী টেনে এনে তার বক্তৃতা শেষ করেছিলেন এই বলে যে, 'আইনস্টাইন হচ্ছেন আমাদের সমসাময়িকদের মধ্যে নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা' আইনস্টাইনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের প্রায় একশ' বছর এর মধ্যে পার হয়ে গেছে, এখনো আমরা সেই আইনস্টাইনীয় বিশ্বে বাস করছি। ভবিষ্যতের কোনো প্রতিভাধর বিজ্ঞানী যে রঙ্গমঞ্চে এসে আইনস্টাইনের এই বিশ্বজগৎকে হটিয়ে দিতে পারবেন না, তা দিব্যি দিয়ে বলা যায় না, তবে এটুকু অন্তত বলা যায় যে, আইনস্টাইন স্বীয় প্রতিভায় উদ্ভাসিত হয়ে নিজে এমন একট জায়গায় পৌছে গেছেন, আর সেই সঙ্গে আমাদের জ্ঞানকে নিয়ে গেছেন অনেক উপরে, আর এজন্য তাকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিভাদের একজন হিসেবে মনে রাখতেই হবে—তা তার তৈরি বিশ্বজগৎ শেষ পর্যন্ত টিকুক আর না-ই টিকুক।

তবে 'প্রতিভাধর' বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু ছেলেবেলায় কখনোই ছিলেন না তিনি। বরং 'মর্নিং শোজ দ্য ডে'-এ প্রবাদবাক্যটি আইনস্টাইনের জীবনে নিদারুণভাবে ব্যর্থই বলতে হবে। স্কুল-কলেজের রেকর্ড যদি বিবেচনা করা হয়, নিতান্তই মাঝারি গোছের তার সমস্ত অর্জন। আইনস্টাইন এমনিতেই ছিলেন একটু ঢিলেঢালা, এমনকি শৈশবে কথা বলাও শিখেছিলেন বেশ দেরি করে দু'বছরের বেশি লেগে গিয়েছিল। সাত বছর পর্যন্ত বাড়িতেই পড়াশোনা চলে তার এক সময় স্কুলেও ভর্তি করা হয় তাকে—ক্যাথলিক স্কুলে। একা একা ঘুরতেন, আপন মনে

কী যেন ভাবতেন। স্বাভাবিকভাবেই রেজাল্ট আহামরি গোছের কিছু হচ্ছিল না তবে রেজাল্টের চেয়েও গুরুতর কিছু সমস্যা নিয়ে বাবা-মা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শিক্ষকরা অভিযোগ করেছেন আইনস্টাইন অন্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একেবারেই মেশে না, পড়া মুখস্ত বলতে পারে না, আর প্রশ্ন করলে অনেকক্ষণ লেগে যায় জবাব দিতে আবার প্রায়ই জবাব দেওয়ার আগে কী যেন বিড়বিড় করে। প্রথম দুটো লক্ষণ না হয় তাও মানা গেল, কিন্তু তৃতীয়টা? ওটির কারণ আর কিছুই নয়— বেতের আঘাতের ভয়। ছোট্ট আইনস্টাইন ভাবলেন, ভুল-ভাল উত্তর দিয়ে স্যারের হাতের বেতের মার খাওয়ার চেয়ে বরং সতর্ক থাকাই তো ভালো! কাজেই ক্লাসে সবার সামনে উত্তর দেওয়ার আগে স্বগতোক্তি করে নিজের কাছেই উত্তরটা পরিষ্কার করে নেওয়া—এই আর কি!

কোনো একটা ব্যাপার মাথায় ঢুকে গেলে সেটার শেষ পর্যন্ত না দেখে তিনি ছাড়তেন না। এর নিদর্শন আমরা পাই আইনস্টাইনের ছোট বোন উইন্টারের লেখা 'আলবার্ট আইনস্টাইন—আ বায়োগ্রাফিকাল স্কেচ' গ্রন্থে। আইনস্টাইন সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাজা লিখেছেন, 'কোনো কিছুতে একবার আকৃষ্ট হলে যেন রোখ চেপে বসত আইনস্টাইনের মাথায়। একবার বাড়িতে এসেছিল মাজার কিছু খেলার সঙ্গী, সবাই মিলে মেতে উঠল তাসের ঘর বানানোর খেলায়। চারতলার চেয়ে বেশি আর কেউই বানাতে পারছিল না। ঠিক এ সময় খেলায় যোগ দেন আইনস্টাইন। প্রথম প্রথম চেষ্টা করতে গিয়ে বেশ কয়েকবারই ভেঙে পড়ে তার তাসের ঘর। ব্যস রোখ চেপে গেল আইনস্টাইনের। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করে করে যে ঘরটি বানালেন আইনস্টাইন— তা ছিল চৌদ্দ তলার!

আইনস্টাইন সম্পর্কে অনেক মজার গল্প আছে। একটা সময় ছিল যখন গুটিকয় বিজ্ঞানীই নাকি বুঝতে পারতেন। অন্যেরা হয়তোবা বোঝার ভান করতেন। তো সেই সময় পৃথিবী জুড়ে আইনস্টাইনের জয়জয়কার। পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। আইনস্টাইন কোন কোন দেশে যাচ্ছেন, কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও যেতে পারছেন না এরকম একটি সময়ে আমেরিকায় রওনা হলেন জাহাজে করে চলেছেন রাতে ডিনার টেবিলে বসেছেন এক মহিলা আইনস্টাইন সম্পর্কে অত ধারণা নেই, তবে এটুকু অন্তত বুঝেছেন যে লোকটি এ জাহাজের একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। তো সেই মহিলা শুরু করলেন আইনস্টাইনের সঙ্গে আলাপ। প্রাথমিক কুশলাদির পর তিনি জানতে চাইলেন

— আচ্ছা আপনি পড়াশোনা করেছেন কোন বিষয়ে বলুন তো?

— সত্যি কথা বলতে কি আমি এখনো পদার্থবিদ্যার ছাত্র

— বলেন কি? আমি তো সেই কবেই পদার্থবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছি। আপনি এখনো ছাত্র?

আইনস্টাইন ১৯০৫ সালে *এনালেন ডার ফিজিকে* পত্রিকায় অসাধারণ তিনটি প্রবন্ধ লেখেন যা পৃথিবীর জ্ঞানবিজ্ঞানের ইতিহাসে এক নতুন বাঁক তৈরি করে

বিজ্ঞান লেখক বিল ব্রাইসন কৌতুক করে বলেন— আইনস্টাইনের প্রথম প্রবন্ধটি লেখা আলোর প্রকৃতি নিয়ে। এই কাজের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান ১৯২১ সালে। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রমাণ করে পরমাণুর সত্যিই অস্তিত্ব রয়েছে। তৃতীয়টি আমাদের জগৎকে সম্পূর্ণ বদলে দেয়। এটি ছিল আইনস্টাইনের স্থান ও কাল নিয়ে লেখা একটি যুগান্তকারী প্রবন্ধ এবং পরবর্তীতে যার নাম হয় 'আপেক্ষিক তত্ত্ব'। নামকরণটি আইনস্টাইন প্রথমে পছন্দ করেন নি। তিনি নাম দিতে চেয়েছিলেন 'চরম অবস্থার তত্ত্ব' বা অন্য কোনো নাম কিন্তু On the Electrodynamics of Moving Bodies নামে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল এবং এটিকেই মানব সমাজের ইতিহাসে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট ও যুগান্তকারী ধারণা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই প্রবন্ধটিতে কোনো পাদটীকা ছিল না এবং গণিতও একেবারে নেই বললেই চলে। অন্য কোনো পুস্তকেরও উল্লেখ ছিল না। সি.পি.স্নো বলেন, 'এটি এমনভাবে তৈরি হয়েছে যে, আইনস্টাইন শুধুমাত্র নিজের চিন্তা দিয়েই প্রবন্ধটির উপসংহার টেনেছেন এবং এজন্য তিনি অন্য কোনো পুস্তক বা মনীষীর মতামত গ্রহণ করেন নি।'

গতিবেগের নিজস্ব সীমা রয়েছে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে বিমানের গতি শব্দের গতির চেয়ে অনেক কম ছিল। আজ মানুষের কাছে 'সুপারসনিক' বিমান রয়েছে। বেতার তরঙ্গ আলোর গতিবেগে ছড়িয়ে পড়ে। তাহলে কি আমরা 'সুপার লাইট' টেলিগ্রাফিও সৃষ্টি করতে পারি, যা আলোর গতির চেয়েও দ্রুত সংকেত পাঠাতে পারবে? না, সেটা করা অসম্ভবই বটে।

বাস্তবিকই, আমরা যদি অসীম গতিতে সংকেত প্রেরণ করতে পারতাম, তাহলে আমরা একইভাবে যে কোনো দুটি ঘটনার যুগপত্ততা প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হতাম সমার্থকভাবে। যদি দ্বিতীয় ঘটনার সংকেতের মতোই প্রথম ঘটনাকে ঘিরে অসীম দ্রুতসম্পন্ন সংকেত একই মূহর্তে পৌছাতো তাহলে আমরা বলতাম যে, ওই দুটি ঘটনা একই সঙ্গে ঘটেছিল। এভাবে দুটি ঘটনার যুগপত্ততা কাঠামো নিরেপেক্ষ পরম চরিত্র অর্জন করে থাকতো, উপরোক্ত দাবিগুলো সত্যি হলে

কিন্তু যেহেতু পরীক্ষা সময়ের পরম প্রকৃতি প্রমাণ করেনি, তাই সিদ্ধান্তে আসবো যে, সংকেত সঞ্চারণ তাৎক্ষণিকভাবে হয় না। স্থানের এক বিন্দু থেকে আরেক বিন্দুতে সঞ্চারণের গতিবেগ অসীম হতে পারে না; অন্য কথায়, এটি নির্দিষ্ট সসীম মানের চেয়ে বড় হতে পারে না, যাকে গতির সীমিতকরণ (limiting speed) বলে।

এই সীমিত গতি আলোর গতিবেগের সঙ্গে একই সময় ঘটে। বাস্তবিকই গতির আপেক্ষিকতার নীতি অনুযায়ী প্রকৃতির নিয়মগুলো একে অন্যের সাপেক্ষে সরলরেখা বরাবর সমবেগে গতিশীল সব প্রসঙ্গ কাঠামোর জন্য একই হবে। কোনো বেগই দেয় সীমার চেয়ে বেশি না—এই দাবিও প্রকৃতির একটি আইন। আর তাই সীমিত দ্রুতির মান বিভিন্ন কাঠামোতে একই রকম হওয়া উচিত আলোর

গতিবেগ আমরা যেমনটা জানি একই গুণাবলীর অধিকারী। এভাবে আলোক দ্রুতি শুধুমাত্র প্রাকৃতিক প্রতিভাস সঞ্চারণের ব্যাপার নয়। এটি অন্যান্য বস্তু বা শক্তির গতিবেগ সীমিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে সীমিত গতির অস্তিত্বের আবিষ্কার মানব প্রতিভা এবং মানবজাতির পরীক্ষণ সামর্থ্যের সবচেয়ে বড়ো বিজয়ের একটি।

উনিশ শতকে পদার্থবিদরা ভাবতেও পারতেন না বা অনুমানে অক্ষম ছিলেন যে, সীমিত গতি (limiting speed) রয়েছে এবং এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হতে পারে। এর কারণ শুধুমাত্র সীমাবদ্ধ পরীক্ষণ ক্ষমতার প্রভাব নয়। তারা দৈবক্রমে পরীক্ষণের সময় যদি এর মুখোমুখি হয়ে হোঁচট খান, তারপরও তারা নিশ্চিত হতেন না যে এটি 'প্রাকৃতিক আইন (natural law)'

আপেক্ষিক তত্ত্বের নীতিগুলো এটাই প্রকাশ করে যে, সীমিত গতিবেগের অস্তিত্ব প্রাকৃতিক বস্তুসমূহে বিরাজমান (very nature of thing)। অনেকেই মনে করেন, প্রাযুক্তিক উন্নতি ঘটিয়ে আমরা আমাদের সীমিত গতিবেগকে কোন এক সময় আলোর গতিবেগের সমান বা তার চেয়ে বেশি গতি অর্জন করতে পারবো। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। এই ব্যাপারটা নিচে বর্ণিত বাক্যটির মতো অর্থ প্রকাশ করে না : বিশ হাজার কিলোমিটারের বেশি দূর থেকে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিন্দু বা অবস্থানগুলোর অনুপস্থিতি ভৌগোলিক আইন নয়, বরং আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের পরিণতি। আশা করা যে, আরও যান্ত্রিক অগ্রগতি ঘটলে, ওইরকম দূরতর জায়গায় থেকেও আমরা পৃথিবীতে অবস্থানগুলো খুঁজে পাব।

আলোর গতিবেগ আসলে এক ব্যতিক্রমী অংশের ভূমিকা পালন করে নিখুঁতভাবে। কারণ এটি হলো যেকোনো কিছুর বিস্তারের জন্য সীমিত গতিবেগ। আলো হয় অন্য সব প্রতিভাসকে পেছনে ফেলে অথবা অন্তত তাদের সঙ্গে একই সময় পৌঁছে।

সূর্য যদি দু'ভাগ হয়ে দুটি নক্ষত্রের সৃষ্টি হয়, তাহলে পৃথিবীর গতি স্বাভাবিকভাবেই পরিবর্তিত হবে

উনিশ শতকের পদার্থবিদরা জানতেন না যে, প্রকৃতিতে সীমিত গতিবেগ রয়েছে, নিশ্চিতভাবে তারা মনে করতেন সূর্যের বিভাজনের পর তৎক্ষণাৎ পৃথিবী তার গতি পরিবর্তন করবে। তথাপি বিভাজিত সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত আলোর আসতে আট মিনিটের দূরত্ব অতিক্রম করতে হবে।

সূর্য বিভক্ত হওয়ার ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড পর পৃথিবীর ঘূর্ণনগতির পরিবর্তিত হওয়া শুরু হবে। ওই সময় পর্যন্ত পৃথিবী তার চলা অব্যাহত রাখবে যেন সূর্য বিভক্ত হয়নি। সূর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত অথবা এর উপর যে কোনো ঘটনা পৃথিবীতে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড না হওয়া পর্যন্ত কোনো প্রতিক্রিয়া শুরু হবে না।

সংকেত বিস্তারের সীমিত গতিবেগ সাধারণত আমাদের দুটি ঘটনার যুগপত্ততা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা থেকে বঞ্চিত করে না। যা আমাদের করতে হবে তা হলো সংকেতের সময়কে পেছানো (lag)। এটা একটা সাধারণ ব্যাপার।

যুগপত্ততার ক্রিয়া প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি, এই ধারণা আপেক্ষিকতার সম্পূর্ণ উপযোগী। বাস্তবিকই, সময়ের পার্থক্যকে বের করতে অবশ্যই দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্বকে আলোক দ্রুতি দিয়ে ভাগ করতে হবে, যেখানে ঘটনাগুলো আলোর সংকেতের গতিবেগ দ্বারা সংঘটিত হয়। অন্যদিকে আমরা আগেই আলোচনা করেছিলাম মস্কো-ভ্লাদিভোস্তক এক্সপ্রেস ট্রেন থেকে চিঠি পাঠানো প্রসঙ্গে। সেখানে আমরা দেখেছিলাম যে, চলন্তস্থানে অবস্থান নির্দিষ্ট করাও সম্পূর্ণ আপেক্ষিক।

আগে ও পরে

চলো আমরা কল্পনা করি যে, বাতিসহ আইনস্টাইন নামের ট্রেনটিতে স্বয়ংক্রিয় কৌশলটি ব্যর্থ হলো এবং ট্রেনের মানুষ লক্ষ্য করল সামনের দরজা পেছনের দরজার চেয়ে ১৫ সেকেন্ড আগে খোলে। বিপরীতভাবে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে মানুষ লক্ষ্য করবে পেছনের দরজা ৪০-১৫=২৫ সেকেন্ড আগে খুলেছে। এটি এমন ঘটনা যা এক কাঠামোর মধ্যে আগে ঘটেছে আর অন্য কাঠামোর মধ্যে পরে হয়েছে।

আমাদের কাছে মনে হয়েছে 'আগে' ও 'পরের' এই আপেক্ষিকতা ধারণারও সীমারেখা থাকা উচিত। মোটের উপর এটি এরকম নয় (যে কোনো কাঠামোর দৃষ্টিকোণ থেকে) যে একটি শিশু তার মায়ের আগেই জন্মেছে।

মনে করি, সূর্যের উপর একটি দাগ গঠিত হলো। টেলিস্কোপের মাধ্যমে সূর্যকে পর্যবেক্ষণকারী একজন জ্যোতির্বিদ ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড পর তা চিহ্নিত করবেন। এরপর জ্যোতির্বিদ যা করবেন তা দাগটি প্রতীয়মান হওয়ার পরমভাবে পরের ঘটনা হবে। সূর্য এবং জ্যোতির্বিদকে দাগসহ পর্যবেক্ষণ করা যাবে যে-কোনো কাঠামোর সাপেক্ষে 'পরে'। অন্যদিকে, জ্যোতির্বিদের কাছে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড আগের সব ঘটনাই দাগ আবির্ভাবের পূর্বে। এই ঘটনার আলোর সংকেত পৃথিবীতে পৌঁছবে দাগের আবির্ভাবের আগে। পরমভাবে আগের ঘটনা হিসেবে স্থান নেবে।

উদাহরণস্বরূপ, জ্যোতির্বিদ যদি তার পর্যবেক্ষণ গ্লাস কোনো মুহূর্তে ওই দুই সময়সীমার মাঝে রাখে, তাহলে দাগের আবির্ভাব এবং গ্লাসের মধ্যকার সময়ের সম্পর্ক আর পরম থাকবে না।

আমরা আপেক্ষিকভাবে জ্যোতির্বিদ ও সূর্যের দাগের সাপেক্ষে এমনভাবে সরতে পারি যেন গ্লাস দিয়ে পর্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্বিজ্ঞানীর আগে বা পরে অথবা দাগ দেখার সময়টাতেই পর্যবেক্ষণ করার মতো করে সরতে পারি, যা নির্ভর করে আমাদের দ্রুতি এবং দিকের ওপর।

আপেক্ষিক তত্ত্ব এভাবে বিষয়টি প্রতিপাদন করে যে তিন ধরনের সময় সম্পর্ক ঘটনাগুলোর মধ্যে রয়েছে, পরমভাবে আগের, পরমভাবে পরে এবং না আগে না পরে অথবা নিখুঁতভাবে বলতে গেলে—আগে ও পরের সম্পর্ক প্রসঙ্গ কাঠামোর ওপর নির্ভররত যা থেকে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করা হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

খেয়ালি ঘড়ি এবং মাপকাঠি

আবারো ট্রেনে

শেষ না হওয়া রেলপথ ধরে আমরা ছুটে চলেছি আইনস্টাইন ট্রেনে। দুটি ট্রেন স্টেশনের মধ্যে দূরত্ব ৮৬ কোটি ৪০ লক্ষ কিলোমিটার। এক ঘন্টায় এই দূরত্ব অতিক্রম করতে ট্রেনটি ছুটে চলবে সেকেন্ডে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার গতিতে

দুটি স্টেশনেই ঘড়ি আছে একজন যাত্রী প্রথম স্টেশন থেকে ট্রেনে উঠে তার ঘড়িটি স্টেশনের ঘড়ি দেখে ঠিক করে নিলেন। দ্বিতীয় স্টেশনে পৌছে তিনি অবাক

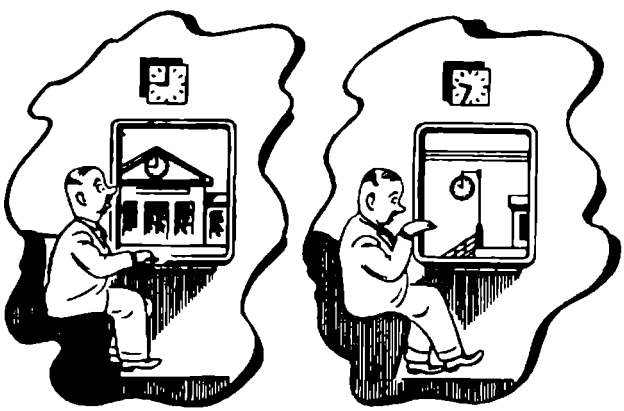

যাত্রীর ঘড়ির সাপেক্ষে আইনস্টাইন ট্রেনটি এক ঘন্টা ৬০মিনিট ধরে ছুটে চলেছে সেকেন্ডে দুই লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার গতিতে কিন্তু পরবর্তী স্টেশনে পৌছে দেখবে স্টেশনের ঘড়িতে ৩৬ মিনিট পার হয়েছে

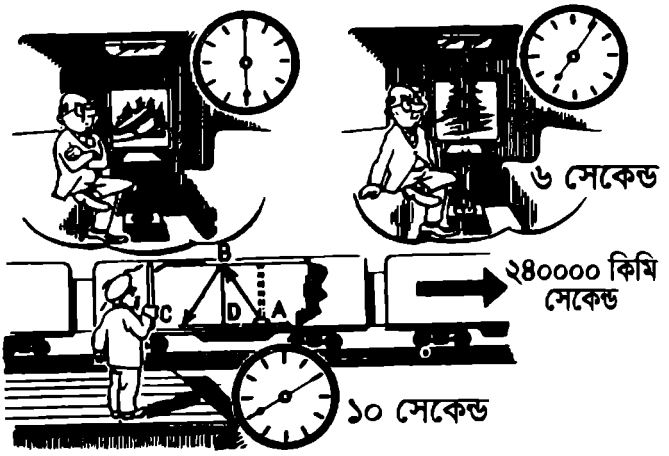

প্ল্যাটফর্মের দর্শক আলোক রশ্মির যাওয়া আসার মধ্যে ১০ সেকেন্ড অতিক্রান্ত হয়েছে বলে দেখবে। আর যাত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত যাওয়া-আসায় ৬ সেকেন্ড অতিক্রান্ত হয়েছে

হয়ে দেখলেন তার ঘড়িটি ধীরে চলছে। ঘড়ি মেরামতের দোকানে তাকে বলা হলো তার ঘড়িটি ঠিকই আছে।

ব্যাপার কি?

এ রহস্যটি উদঘাটনের জন্য মনে করি, যাত্রীটি একটি বৈদ্যুতিক টর্চ কামরার মেঝেতে স্থাপন করে ছাদে আলোর রশ্মি ফেললো সিলিং-এর একটি আয়নায় রশ্মিটি প্রতিফলিত হয়ে টর্চের কাছে ফিরে এল যাত্রীটির রশ্মির পথটা এ পৃষ্ঠার ওপরের ছবিতে দেখানো হয়েছে। প্ল্যাটফর্মের দর্শকের কাছে এটা ভিন্নরকম দেখাবে। টর্চের রশ্মি আয়নার কাছে পৌছনোর সময়, আয়নাটি ট্রেনের গতির কারণে সরে যাবে। যখন রশ্মিটি প্রতিফলিত হয়ে টর্চের কাছে ফিরে আসবে তখন একই দূরত্বে স্থানান্তরিত হবে রশ্মিটি

আমরা লক্ষ্য করি যে, প্ল্যাটফর্মের পর্যবেক্ষকের কাছে ট্রেনের ওইগুলোর চেয়েও পরিষ্কারভাবে বেশি দূরত্ব পাড়ি দিতে পারে আলোর রশ্মি। অন্যদিকে আমরা জানি যে, আলোর গতিবেগ একটি পরমবেগ আর তা ট্রেনের যাত্রীদের কাছে এবং প্ল্যাটফর্মের পর্যবেক্ষক বা দর্শকদের কাছে একই। তাই আমরা সিদ্ধান্ত টানব যে, স্টেশনে ট্রেনের চেয়ে অধিকতর বড় ধরনের মধ্যবর্তী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে রশ্মির যাওয়া এবং ফিরে আসার কালে।

সম্পর্কটি হিসাব করা সহজ। মনে করা যাক, প্ল্যাটফর্মের দর্শকটি আলোর রশ্মির যাওয়া-আসার মধ্যে ১০ সেকেন্ড অতিক্রান্ত হয়েছে মেনে নিল এই ১০ সেকেন্ডে রশ্মিটি ভ্রমণ করেছিল ৩০০,০০০×১০ = ৩,০০০,০০০ বা ৩০ লক্ষ

কিলোমিটার। এটি অনুসরণ করে যে, সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ ABC-এর AB এবং BC বাহু প্রতিটি ১৫ লক্ষ কিলোমিটার। দৃশ্যত ১০ সেকেন্ডে ট্রেনটি যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে AC তার সমান, অর্থাৎ ২,৪০,০০০×১০=২,৪০০,০০০ বা ২৪ লক্ষ কিলোমিটার!

এখন কামরাটির উচ্চতা বের করার সহজ উপায় হলো ত্রিভুজ ABC-এর উচ্চতা BD-কে মাপা। এই BD হলো কামরাটির উচ্চতার সমান।

পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে, সমকোণী ত্রিভুজে অতিভুজের বর্গ (AB) বাকী AD ও BD দু বাহুর বর্গগুলোর সমষ্টি। সমীকরণের আকারে সাজালে

$AB^2 = AD^2 + BD^2$ পিথাগোরাসের এই উপপাদ্য দিয়ে ট্রেনের কামরার উচ্চতা BD বের করতে সাহায্য করবে

অর্থাৎ $BD = \sqrt{(AB^2 - AD^2)}$

বা $BD = \sqrt{(১,৫০০,০০০২ - ১,২০০,০০০২)}$

বা $BD = ৯০০,০০০$

বা উচ্চতা BD = ৯ লক্ষ কিলোমিটার।

যথেষ্ট উঁচু হওয়া সত্ত্বেও আইনস্টাইন ট্রেনের জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক মাত্রা বিবেচনা করলে এটা খুব অবাক করে না। উল্লেখ্য এখানে $AD = \frac{১}{২} AC$

যাত্রীর দৃষ্টিকোণ থেকে, মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত রশ্মির যাওয়া এবং ফিরে আসায় অবশ্যই উচ্চতার দুইগুণ পথ অতিক্রম করেছে আলোর রশ্মি অর্থাৎ ২ × ৯০০,০০০ = ১,৮০০,০০০ বা ১৮ লক্ষ কিলোমিটার। এই দূরত্ব পাড়ি দিতে রশ্মির লাগবে $\frac{১,৮০০,০০০ \text{ কি.মি.}}{৩০০,০০০ \text{ কি.মি./সে}} = ৬$ সেকেন্ড।

স্ববিরোধী ঘড়ি

রেলস্টেশনে যখন ১০ সেকেন্ড অতিক্রম হয়েছিল, তখন মাত্র ৬ সেকেন্ড পার হয়েছিল ট্রেনে। তার মানে, যদি ট্রেনটি যাত্রার এক ঘণ্টা পর স্টেশনের ঘড়ি অনুযায়ী পৌঁছায়, এটি যাত্রীর ঘড়ি অনুযায়ী ভ্রমণ করবে মাত্র ৬০ × $\frac{৬}{১০}$ = ৩৬ মিনিট। অন্য কথায়, এক ঘণ্টায় স্টেশনের ঘড়ি থেকে তার ঘড়ি ২৪ মিনিট পিছিয়ে থাকবে।

সহজেই দেখা যাবে ট্রেনের গতি যত বেশি হবে সময়ের পার্থক্যও তত বাড়বে।

বস্তুত ট্রেনের গতি আলোর গতির কাছাকাছি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ট্রেনের অতিক্রান্ত নির্দেশরত বাহু AD আলোর চলার একই সময়ে অতিক্রান্ত অতিভুজ AB-এর নিকটতর হবে। অতিভুজের তুলনায় বাহু BD সঙ্গতি রেখেই হ্রাস প্রাপ্ত হয়। তারপরও এই সম্পর্ক ট্রেনের সঙ্গে প্ল্যাটফর্মের সময় সম্পর্ক উপস্থাপন করে ট্রেনের গতি বৃদ্ধি পেয়ে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি হলে স্টেশনের সময়ের প্রতিঘণ্টায় ট্রেনের সময় একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অবস্থা পরিবর্তিত হতে পারে।

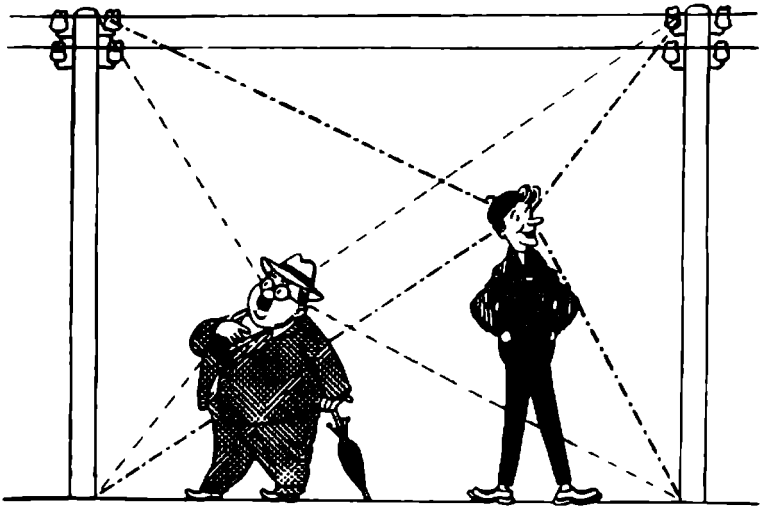

ঘড়ি ধীরলয়ে চলার ব্যাপারটা তুলনা করা যায় দু'জন পর্যবেক্ষকের ভিন্ন ভিন্ন টেলিগ্রাফ খুটির পাশে দাঁড়ানো অবস্থার সঙ্গে। প্রত্যেকে দাবি করে যে খুটির পাশে সে দাঁড়িয়েছে তা অন্যটির চেয়ে বড় কোণে দেখা যায়

উদাহরণস্বরূপ, আলোর গতির কাছাকাছি ০.৯৯৯৯ গতিতে স্টেশনের সময়ের এক ঘন্টায় ট্রেনে মাত্র এক মিনিট পার হবে।

ফলশ্রুতিতে, ভ্রমণরত সব ধরনের ঘড়িই স্থির ঘড়িগুলো থেকে পিছিয়ে পড়বে। এটি কি আপেক্ষিক তত্ত্বের বিরোধিতা করে, যেখান থেকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে আমরা অগ্রসর হয়েছিলাম?

এটার মানে কি যে-ঘড়িটি অন্যগুলোর তুলনায় দ্রুত সেটি পরম স্থির অবস্থায় আছে?

না, এটি সে-রকম কোনো ব্যাপার নয়। কারণ, ট্রেন এবং স্টেশনের ঘড়ির মধ্যে তুলনা পুরোপুরি অসমান অবস্থার ওপর তৈরি। প্রকৃত পক্ষে, দু'টি নয়, ওখানে তিনটি ঘড়ি ছিল। যাত্রীটি দুইটি ভিন্ন স্টেশনে দুইটি ভিন্ন ঘড়ির সঙ্গে নিজের ঘড়িটিকে মিলিয়েছিল। আর বিপরীতক্রমে যদি ট্রেনের কামরার সামনে এবং পেছনে ঘড়ি থাকতো, ট্রেন থেকে পর্যবেক্ষক স্টেশনের ঘড়ির সঙ্গে ট্রেনের ঘড়িগুলোকে মিলিয়ে দেখে, তাহলে আবিষ্কার করবে যে স্টেশনের ঘড়ি সবসময় পিছনে

স্টেশনের সাপেক্ষে ট্রেনটি সমবেগে সোজা রেখা ধরে চললে একে আমরা স্থির এবং স্টেশনকে চলন্ত হিসেবে বিবেচনা করতে পারি তাদের মধ্যে কার্যরত প্রকৃতির আইন অবশ্যই সমান হবে।

প্রতিটি এবং প্রত্যেক পর্যবেক্ষকের যারা ঘড়ির হিসাবে নিশ্চল তারা লক্ষ্য করবে যে, তাদের সাপেক্ষে অন্য ঘড়িগুলো ধীর লয়ে চলবে। ঘড়িগুলোর গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো আরো ধীর লয়ে চলবে।

এটি তুলনা করা যায় দু'জন পর্যবেক্ষকের ভিন্ন ভিন্ন টেলিগ্রাফের খুঁটির পাশে দাঁড়ানো অবস্থার সঙ্গে প্রত্যেকে দাবি করছে যে-খুঁটির পাশে সে দাঁড়িয়েছে তা অন্যটির চেয়ে বড়ো কোণে দেখা যায়।

টাইম মেশিন

এখন, ধারণা করি যে, আইনস্টাইন ট্রেন সরল রেখায় না চলে বৃত্তাকার রেলপথে চলে। এটি নির্দিষ্ট সময় পরে যাত্রার স্থানে ফিরে আসে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি, যাত্রী আবিষ্কার করবে যে, তার ঘড়ি ধীর এবং ট্রেনের গতি দ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘড়িটিও ধীরতর গতিতে চলতে থাকবে। ট্রেনের গতি বৃদ্ধি করে আমরা এমন এক স্থানে পৌঁছতে পারি যেখানে শুধু একদিন পার হয়েছে বলে মনে হবে যাত্রীদের। অথচ স্টেশন মাস্টারের জন্য কয়েক বছর অতিক্রান্ত হয়। বাস্তবিকই অনেক বছরই অতিক্রান্ত হতে পারে। যে স্টেশন থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি দিনের ভ্রমণ শেষে (নিজের ঘড়ি অনুযায়ী) সে স্টেশনে ফিরে আমাদের যাত্রী জানতে পারবে যে, তার সব আত্মীয়, বন্ধুরা অনেক আগেই মারা গেছে।

বৃত্তাকার রেলপথে ভ্রমণের সময়, ট্রেনের ভিতর এবং যাত্রাশুরুর স্টেশনটি থেকে মাত্র দুটি ঘড়ির সময় তুলনা করে দেখা হয়েছিল।

এতে কি এমন কিছু আছে যা আপেক্ষিক তত্ত্বের নীতির বিরোধিতা করে? আমরা কি বিবেচনা করতে পারি যে, যাত্রীরা স্থির অবস্থায় এবং যাত্রা শুরুর স্টেশনই আইনস্টাইন ট্রেনের গতিতে বৃত্তাকার পথে ছুটে চলেছে? আমরা তারপর উপসংহারে আসব যে, মাত্র একটি দিন অতিক্রান্ত হয়েছে স্টেশনের লোকদের কাছে। যেখানে ট্রেনের যাত্রীদের অনেক বছর চলে গিয়েছে। না এটা একটি ভুল অনুমান হবে তার কারণ এখানে বলা হলো।

আমরা উপরে প্রতিষ্ঠা করেছি যে, একটি বস্তু তখনই স্থির হিসেবে বিবেচিত হতে পারে যখন এটি বাইরের শক্তির প্রভাব বুঝতে পারে না। এটা সত্য যে, শুধু এরকম স্থির অবস্থা একটি নয় তাদের সংখ্যা অগণিত এবং দুটি স্থির বস্তু আমরা যেমনটা জানি পরস্পরের সাপেক্ষে কোনো একটি নির্দিষ্ট গতিতে সরলরেখা বরাবর চলে। কিন্তু আইনস্টাইন ট্রেনের ঘড়ি বৃত্তাকার রেলপথ ধরে চলে তা সেন্ট্রিফিউগ্যাল বলের প্রতিক্রিয়ার অভিজ্ঞতা জানে। সেন্ট্রিফিউগ্যাল বলের কারণেই বস্তুসমূহ বা যাত্রীরা বৃত্তাকার রেলপথের কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে ছিটকে পড়তে চায়। আর আমরা তাই একে স্থির অবস্থার দশা বলে গণ্য করতে পারি না। রেলওয়ে স্টেশনের ঘড়িতে দেখানো সময় এবং ট্রেনের ঘড়ির সময়ের পার্থক্য পরম।

যদি দু'জনের ঘড়িতে একই সময় অংশ দেখায়, তারপর আবার দেখা হলে যার ঘড়ি স্থির অবস্থায় অথবা সরলরেখা ধরে একই গতিতে চলে তার ঘড়ি দ্রুত চলবে।

প্রায় আলোর দ্রুতিতে গতিশীল মহাকাশযানে ২০ আলোকবর্ষ দূরে ঘুরে আসার পর দেখবে যমজের সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য প্রায় ২০ বছর হয়ে গেছে। জৈবিক, অজৈবিক সব প্রক্রিয়ার বেলায় এটা সত্যি।

কারণ, এটি কোনো শক্তির প্রভাব (effect) জানতে পারছে না।

বৃত্তাকার রেলপথে আলোর কাছাকাছি গতিতে ভ্রমণ বিখ্যাত কল্পকাহিনী লেখক এইচ জি ওয়েলসের টাইম মেশিনের বাস্তবতা খুঁজে পায় স্বল্প পরিসরে হলেও। শেষ পর্যন্ত যাত্রা শুরুর স্টেশনে ফিরে কামরার বাইরে পা রাখলে দেখবে আমরা আসলে বহু দূরের ভবিষ্যতে পা রেখেছি। আমরা ট্রেনে ভবিষ্যতে যেতে পারি, কিন্তু আমাদের অতীতে ফিরতে পারি না। সেদিক থেকে আইনস্টাইন ট্রেন এবং ওয়েলসের টাইম মেশিনে বড় পার্থক্য রয়েছে।

বিজ্ঞান যত অগ্রসরই হোক না কেন, অতীত ভ্রমণে আমরা সক্ষম হব এমনটি কখনো আশা করা যায় না। অবশ্য এটা সত্য হলে তত্ত্বটির সত্যিকারের উদ্ভট অবস্থাগুলো স্বীকার করতে আমরা বাধ্য হব। একবার কল্পনা করো যে অতীতে যাত্রা করে একজন ব্যক্তি পুরোপুরি এমন এক সময়ে চলে যাবে যেখানে তার বাবা-মা তখনো জন্মগ্রহণ করেনি। ফলে অদ্ভুত ধরনের বিপাকে পড়ে যাবে।

আসলে অতীতে ভ্রমণ বিপরীত কিছু ধারণা ছাড়া আর কিছুই যুক্ত করে না। ফলে মৌলিক প্রতিবন্ধকতা দেখা দিতে পারে।

নক্ষত্রলোকে যাত্রা

আকাশে অজস্র নক্ষত্রের অবস্থান। তাদের মধ্যে এমন কত নক্ষত্র আছে যারা আমাদের থেকে অনেক দূরে। এত দূরে যে আলোর রশ্মি তাদের কাছে পৌঁছতে ৪০ বছর লাগিয়ে দেয়। যেহেতু আমরা ইতিমধ্যে জানি যে, আলোর চাইতে দ্রুত

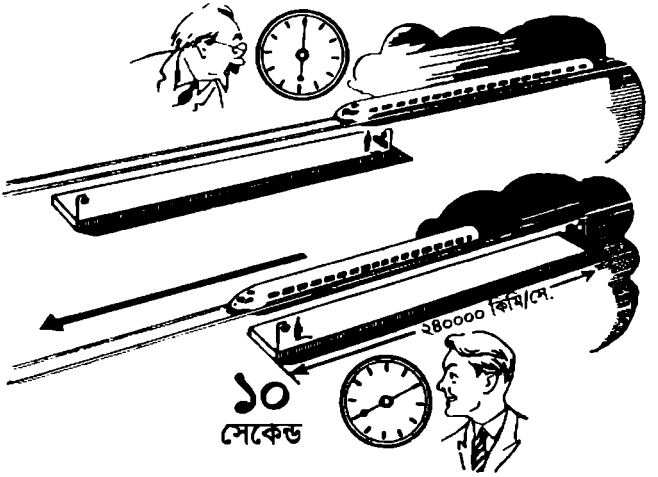

ছবি - ৫.৫: আইনস্টাইন ট্রেন ২৪ লক্ষ কিলোমিটার লম্বা স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম পেছনে ফেলে ছুটে চলেছে। ট্রেনটি স্টেশনের ঘড়ি অনুযায়ী প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে পৌঁছতে সময় নেবে $\frac{২,৪০০,০০০}{২৪০,০০০}$ = ১০ সেকেন্ডে

গতিতে ভ্রমণ করা অসম্ভব। তাই আমরা স্বাভাবিকভাবেই উপসংহার টানতে পারি যে নক্ষত্রটিতে ৪০ বছরের কম সময়ে পৌঁছনো সম্ভব নয়। তবুও, এই অনুমান ভুল কারণ, আমরা সময় সংকোচন গতির সঙ্গে যুক্ত করিনি।

মনে করি, আমরা আইনস্টাইন মহাকাশযানে সেকেন্ডে ২ লাখ ৪০ হাজার কিলোমিটার গতিতে নক্ষত্রের দিকে উড়ে চলছি। পৃথিবীর লোকদের হিসাবে আমরা নক্ষত্রে পৌঁছাব

$$\frac{৩০০,০০০ \times ৪০}{২৪০,০০০} = ৫০ \text{ বছরে।}$$

কিন্তু আমাদের জন্য, মহাকাশযানে চড়ে উল্লেখিত গতিতে চললে ওড়ার সময়ের অনুপাত ১০ থেকে ৬-এ কমে আসবে আমরা নক্ষত্রে পৌঁছাব $\frac{৬}{১০} \times ৫০ = ৩০$ বছরে, ৫০ বছরে নয়।

আমরা আলোর গতির কাছাকাছি না হওয়া পর্যন্ত আইনস্টাইন মহাকাশযানের গতি বাড়িয়ে অনির্দিষ্টভাবে ওড়ার সময় কমাতে পারি, তাত্ত্বিকভাবে যথেষ্ট উচ্চগতির দ্রুতিতে আমরা নক্ষত্রে পৌঁছতে এবং পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারি মাত্র ১ মিনিটের মধ্যে কিন্তু পৃথিবীতে ৮০ বছর পার হয়ে যাবে এইটুকু সময়ের মধ্যে।

যতদূর বোঝা যায়, আমরা এভাবে মানবজীবন দীর্ঘ করার পথ আয়ত্ত করেছি যদিও শুধু অন্য মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে, যেহেতু মানুষ 'তার' নিজস্ব সময় অনুযায়ী

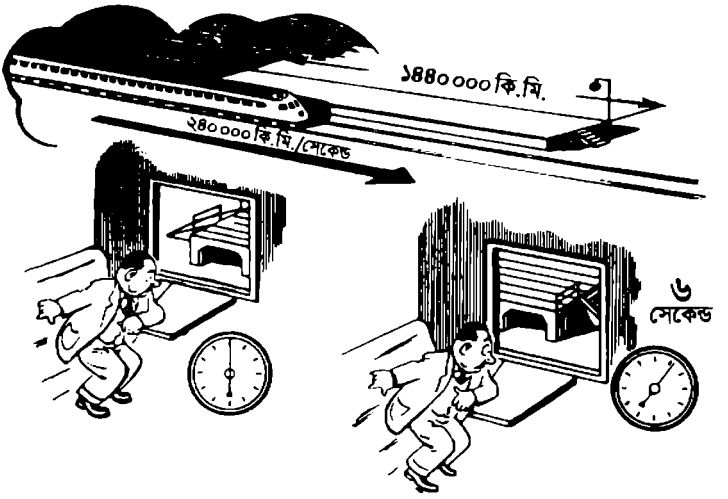

যাত্রীদের ঘড়ি অনুযায়ী প্ল্যাটফর্ম পার হতে ট্রেনটি মাত্র ৬ সেকেন্ড সময় নেবে। যাত্রীদের এই সিদ্ধান্তে আসা সম্পূর্ণ যৌক্তিক হবে যে প্ল্যাটফর্মটি ২৪ লক্ষ কিলোমিটার লম্বা নয়। বরং ২৪০,০০০×৬ = ১৪৪০০০০ কিলোমিটার লম্বা হবে

বয়োবৃদ্ধ হয়। যেভাবে হোক আমাদের কাছে এটা অনুতাপের ব্যাপারই। কারণ কাছ থেকে এটিকে দেখলে এই দিকটি বিভ্রান্তিকর।

গোড়াতেই ভূপৃষ্ঠস্থ মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের চেয়ে যথেষ্ট বেশি ত্বরণে দীর্ঘ সময় ধরে অবস্থান করার ক্ষেত্রে মানবদেহ অভিযোজিত হয় না। ফলে আলোর কাছাকাছি দ্রুতিতে আনতে যথেষ্ট সময় ধরে অল্প ত্বরণে গতিবৃদ্ধি বা ত্বরণায়িত করার প্রয়োজন হবে হিসাবে দেখা যায় যে, মাধ্যাকর্ষণের সমান ত্বরণে ৬ মাস ভ্রমণের সময়ে আমাদের অর্জনের পরিমাণ হবে মাত্র ৬ সপ্তাহের সমান। যদি আমরা আমাদের ভ্রমণ প্রলম্বিত করি, সময়ের দীর্ঘসূত্রতা দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। ১২ মাস কোনো উড়ন্ত রকেটে অতিরিক্ত অর্জন হবে ১৮ মাস : ২ বছরের ভ্রমণে ২৮ বছর বাড়বে, আর যদি আন্তগ্রহ ভ্রমণে তিন বছর পার করি আমরা পাব ৩৬০ বছরেরও বেশি!

খুব স্বস্তিদায়ক চিত্র, তাই?

শক্তির ব্যয়ের খরচ প্রসঙ্গে আসলে বিষয়টি খুব একটা আনন্দের হবে না। মামুলি এক টন ওজনকে উঠিয়ে নিয়ে একটি রকেট সেকেন্ডে ২ লাখ ৬০ হাজার কিলোমিটার গতিতে উড়লে (সময়কে 'দ্বিগুণ' করতে এই গতি প্রয়োজন, অর্থাৎ রকেটের এক বছর পৃথিবীর দুই বছরের সমান) ব্যয় হবে ২৫০,০০০,০০০,০০০,০০০ কিলোওয়াট-ঘণ্টা যে পরিমাণ শক্তি পৃথিবীতে উৎপন্ন হতে কয়েক মাস লেগে যায়।

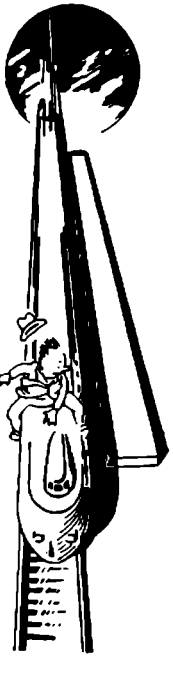

ডানের ছবিতে আমরা দেখি যে, প্ল্যাটফর্মটি ট্রেনের চাইতে লম্বা আর বামের ছবিতে প্ল্যাটফর্মের চাইতে ট্রেনটি লম্বা

এই ছবিগুলো দেখায় যে স্টেশন থেকে এবং গতিশীল ট্রেন থেকে পর্যবেক্ষকরা আইনস্টাইন ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্ম দেখছেন

তবুও ওটা উড়ন্ত সময়ে রকেট কতটুকু ব্যয় করে সেই হিসাব মাত্র আমাদের এখনো হিসাব বের করতে হবে কতটুকু শক্তি এটি গ্রহণ করে মহাকাশযানে গতি সেকেন্ডে ২ লাখ ৬০ হাজার কিলোমিটার বাড়াতে গিয়ে। অধিকন্তু, যাত্রা শেষে মহাকাশযানটিকে নিরাপদ অবতরণের জন্য গতি কমাতে হয় কতটুকু শক্তি তখন লাগে বা প্রয়োজন হয়?

এমন কি সর্বোচ্চ বেগ অর্থাৎ আলোর গতিতে একটি রকেট ইঞ্জিন সচলের জন্য গ্যাস নির্গত করে তাহলেও আমরা যতটুকুর কথা উপরে উল্লেখ করেছি তার চেয়ে ২০০ গুণ বেশি পরিমাণ জ্বালানি লাগতো। অন্য কথায়, আমরা শক্তির (power) এমন পরিমাণ ব্যবহার করতে হবে যা উৎপন্ন করতে পৃথিবীর কয়েক যুগ লেগে যাবে। প্রকৃতপক্ষে, গ্যাসের বেগ আলোর গতির চাইতে হাজার গুণ কম হওয়ায় আমাদের কাল্পনিক অভিযাত্রার ব্যয়ভার হবে দানবীয়!

দৈর্ঘ্যের সংকোচন

সময়কে আমরা যেভাবে দেখেছি তাতে বাস্তবিকই এটি পরম ধারণা হতে পারে না। এটি আপেক্ষিক তবে এটাকে বর্ণনা করতে হলে প্রয়োজন হয় সেই কাঠামোর যথাযথ নির্দেশনা যেখান থেকে এই পর্যবেক্ষণ পরিচালিত হয়।

এখন আমরা স্থানের দিকে ফিরব এমন কি পূর্বেও দেখেছিলাম, মাইকেলসনের পরীক্ষা নিয়ে আলোচনার সময়েও দেখেছি যে, স্থান আপেক্ষিক স্থানের আপেক্ষিকতা সত্ত্বেও বস্তুর মাত্রার ওপর আমরা একটি পরম বৈশিষ্ট্য আরোপ করি অন্য কথায়, আমরা তাদেরকে বস্তুর ধর্ম হিসেবে গণ্য করতাম, যা কাঠামোর ওপর নির্ভর করেনি, যেখান থেকে আমাদের পর্যবেক্ষণ সম্পন্ন করতাম ; তবুও আপেক্ষিক তত্ত্ব আমাদের একই সঙ্গে বাধ্য করে এই দৃঢ় বিশ্বাস পরিত্যাগে। অবশ্য সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণা পরম হওয়ার মতো সংস্কার গড়ে তোলার কারণ হচ্ছে আমরা সবসময় কাজ করেছি আলোর দ্রুতির চাইতে অনেক ছোট ছোট গতি নিয়ে

কল্পনা করা যাক যে, আইনস্টাইন ট্রেন ২৪ লাখ কিলোমিটার লম্বা স্টেশন প্ল্যাটফর্ম পেছনে ফেলে ছুটে চলেছে ট্রেনটি স্টেশনের ঘড়ি অনুযায়ী, প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে $\frac{২৪০০০০০}{২৪০০০০}$=১০সেকেন্ডে পার হয়। কিন্তু যাত্রীদের ঘড়ি অনুযায়ী ট্রেনটি মাত্র ৬ সেকেন্ড সময় নেবে। যাত্রীদের এই সিদ্ধান্তে আসা সম্পূর্ণ যৌক্তিক হবে যে প্ল্যাটফর্ম ২৪ লাখ কিলোমিটার নয়, বরং ২৪০,০০০ × ৬=১,৪৪০,০০০ কিলোমিটার লম্বা।

আমাদের দেখা অনুসারে, প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য প্ল্যাটফর্মের সাপেক্ষে স্থির কাঠামো থেকে দেখলে অপেক্ষাকৃত বেশি লম্বা লাগবে। কারণ প্রত্যেক চলন্ত বস্তু তাদের চলাচলের পথকে গতির দিক বরাবর সংকুচিত করে ফেলে।

তারপরও এই সংকোচন আদৌ প্রমাণ করে না যে, গতি পরম; বস্তু এর সত্যিকারের মাত্রা অর্জন করে যখন স্থির কাঠামো থেকে বস্তুটিকে দেখা হয় একইভাবে যাত্রীরা বুঝবে যে প্ল্যাটফর্মটি সংকুচিত করা হয়েছে, যখন প্ল্যাটফর্মের লোকেরা ভাববে যে, আইনস্টাইন ট্রেন ছোট হয়ে গিয়েছে (৬ ও ১০ এর অনুপাতে)।

এটি শুধু দৃষ্টিবিভ্রম নয়। বস্তুটির দৈর্ঘ্য পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত সকল যন্ত্র পরিমাপ করে দেখাবে এই ঘটনাটিকে এই আবিষ্কারের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে পূর্বের আলোচিত আইনস্টাইন ট্রেনের দরজা খোলার সময় সম্পর্কে আমাদের ধারণা এখন অবশ্যই সঠিক করতে হবে। যখন আমরা প্ল্যাটফর্মের পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে দরজা খোলার সময়ের হিসাব করতাম, ধারণা করতাম যে, একটি চলন্ত ট্রেনের দৈর্ঘ্য স্থির ট্রেনের মতো। ট্রেনটি প্ল্যাটফর্মের লোকদের কাছে ছোট হওয়ার কারণে দরজাগুলো খোলার সময়ের বিবর্তি স্টেশনের ঘড়ির দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতপক্ষে মাত্র $\frac{৬}{১০}$×৪০ = ২৪ সেকেন্ড হবে। ৪০ সেকেন্ড নয়।

স্বাভাবিকভাবে, আমরা আগে যে উপসংহার টেনেছিলাম তার জন্য এই সংশোধন প্রয়োজনীয় নয়।

পূর্বের পৃষ্ঠার ছবিগুলো দেখায় যে স্টেশন থেকে এবং গতিশীল ট্রেন থেকে পর্যবেক্ষকরা আইনস্টাইন ট্রেন এবং প্ল্যাটফর্ম দেখছেন।

ডানের ছবিতে আমরা দেখি যে, প্ল্যাটফর্মটি ট্রেনের চাইতে লম্বা আর বামের ছবিতে প্ল্যাটফর্মের চাইতে ট্রেনটি লম্বা।

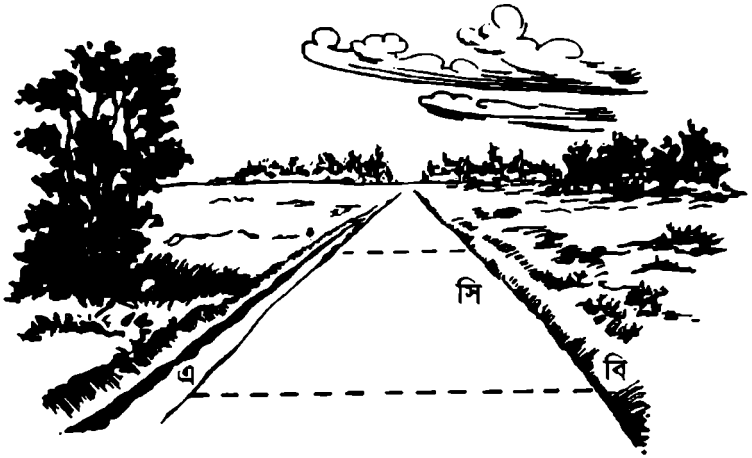

কোন ছবিটি বাস্তবতার সঙ্গে মিলবে? এই প্রশ্নটি অর্থহীন, পূর্বের আলোচিত রাখাল এবং গরুর প্রসঙ্গে প্রশ্নটির মতো

এই দুই প্রতিভাস তাৎক্ষণিক তোলা একই ছবির এবং একই বাস্তবতা, যা ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির থেকে নেওয়া হয়েছে।

খেয়ালি গতি

রেলপথের সাপেক্ষে একজন যাত্রীর দ্রুতি কত হবে যদি সে ঘন্টায় ৫০ কিলোমিটার ছুটে চলা ট্রেনের সামনের অংশের দিকে ঘন্টায় ৫ কিলোমিটার হেঁটে চলে? দৃশ্যত তা হবে ঘন্টায় ৫০+৫=৫৫ কিলোমিটার আমাদের উত্তরের ভিত্তি হচ্ছে গতিবেগ যোগ করার সূত্রের ওপর এবং তাতে আমাদের আর যা-ই হোক, কোনো সন্দেহ নেই বস্তুত ট্রেনটি এক ঘন্টায় ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ করবে এবং ট্রেনের মানুষটি ভ্রমণ করবে অতিরিক্ত ৫ কিলোমিটার। মোট ৫৫ কিলোমিটার।

এটি স্পষ্ট যে, সীমিত গতির অস্তিত্ব ছোট ও বড় গতিগুলো সর্বক্ষেত্রে গতিবেগ সংযোজনের নিয়মকে অকাজের করে ফেলেছে। যদি আইনস্টাইন ট্রেনটি চলে সেকেন্ডে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার এবং যাত্রীটি ট্রেনের ওপর সেকেন্ডে ১ লাখ কিলোমিটার গতিতে ভ্রমণ করে। তাহলে তার গতি রেলপথের সাপেক্ষে হবে ২৪০,০০০ + ১০০,০০০ = ৩৪০,০০০ কিলোমিটার/সেকেন্ড বা সেকেন্ডে ৩ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার কিন্তু এখানে এমন ধরনের কোনো গতি নেই। কারণ এটি আলোর গতিকে অতিক্রম করে।

ফলে, আমাদের প্রতিদিনের জীবনে গতিবেগ যোগের যে সূত্র আমরা ব্যবহার করি, তা পুরোপুরি সঠিক নয়। এটি শুধু তখনই প্রয়োগ করা যায়, যখন আলোর চেয়ে অনেক কম থাকে এর গতিবেগে।

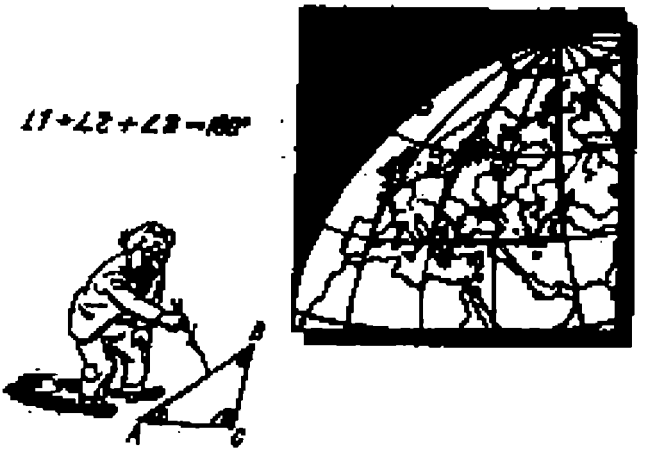

একটি সমতল ত্রিভুজে A, B এবং C বস্তুর সমষ্টি ২ সমকোণের সমান। এখন কল্পনা করা যাক, পৃথিবীপৃষ্ঠে একটি ত্রিভুজ আঁকা হলো (ডানদিকের ছবিতে) এ ত্রিভুজের কোণগুলোর সমষ্টি পৃথিবীর গোলাকৃতির জন্য দুই সমকোণের চেয়ে বড় হবে। এ পার্থক্য শুধু তখনই লক্ষণীয় হবে, যখন ত্রিভুজটির আকৃতি পৃথিবীর ত্রিভুজের সঙ্গে তুলনীয় হবে

ইতিমধ্যেই যারা আপেক্ষিক তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত সব ধরনের স্ববিরোধী বিষয়ের (Paradox) সঙ্গে অভ্যস্ত হয়ে গেছ। সহজেই তারা বুঝবে কেন দৃশ্যত গতিবেগ যোগ করার তত্ত্বের অকাট্য যুক্তি অপর্যাপ্ত, যে সিদ্ধান্তে আমরা কেবল উপনীত হয়েছি। আমরা এক ঘন্টায় ট্রেনের পাড়ি দেওয়া দূরত্বকে যোগ করেছি যাত্রীর ট্রেনে পার করা দূরত্বের সঙ্গে। তবুও আপেক্ষিক তত্ত্ব আমাদের দেখায় যে, এসব দূরত্ব যোগ করা যায় না। এটি ঠিক ওপরে দেখানো ছবিতে রাস্তার কোনো অংশের ক্ষেত্রফল খোঁজার মতোই, পরিপ্রেক্ষিতের কারণে ছবিতে পরের অংশটির আকৃতি বিকৃত হয়ে যাওয়া ভুলেই AB কে BC দিয়ে গুণ করার মতোই উদ্ভট। তাছাড়া স্টেশনের সাপেক্ষে যাত্রীর দ্রুতি বের করতে আমাদের অবশ্যই স্টেশনের ঘড়ি ব্যবহার করতে হবে। ওই ঘড়ি অনুযায়ী এক ঘন্টায় সে কতটুকু দূরত্ব পাড়ি দিল, তা বের করতে হবে। কিন্তু সে-সময়ে ট্রেনে তার গতিতে পৌছতে আমরা ব্যবহার করেছিলাম ট্রেনের ভিতরকার ঘড়ি, আমরা ইতিমধ্যেই জানি, যতদূর সম্ভব যা এক হবে না।

এটি আমাদের এ সিদ্ধান্তে উপনীত করে যে, গতিবেগগুলোর অন্তত একটি যদি আলোর গতির সঙ্গে তুলনীয় হয়, সেক্ষেত্রে বেগগুলোর সংযোজন আমাদের অভ্যস্তরীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা পরীক্ষামূলকভাবে এ স্ববিরোধীমূলক গতিবেগের যোগ করা পর্যবেক্ষণ করতে পারি এখন। উদাহরণস্বরূপ, পানিতে প্রবাহিত আলোর বিস্তার দেখি যা আমরা আগেই আলোচনা করেছি বয়ে চলা পানিতে আলোর গতিবেগের বিস্তার স্থির পানিতে আলোর গতিবেগ ও পানির

প্রবাহের যোগফলের পরিমাণের চেয়ে কম এবং সমান নয়, এটাই হলো আপেক্ষিক তত্ত্বের সরাসরি ফলাফল।

তাদের একটির গতি একেবারে আলোর গতির সমান অর্থাৎ সেকেন্ডে ঠিক ৩ লক্ষ কিলোমিটার হয় তাহলে খুবই অদ্ভুত উপায়ে এই গতিবেগগুলোর যোগ হয়। এই গতিবেগ সবসময় অপরিবর্তিত থাকার বৈশিষ্ট্য ধারণ করে, যে কাঠামোগুলো থেকে আমরা পর্যবেক্ষণ করি সেগুলোর গতি বিবেচনায় না এনে। অন্য কথায়, যত গতিবেগই সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটারের সঙ্গে যোগ করা হোক না কেন, আমরা সেকেন্ডে ৩ লক্ষ কিলোমিটারের বেশি পাব না।

গতিবেগগুলো যোগের সাধারণ নীতির অপ্রয়োগযোগ্যতার সাপেক্ষে একটি সাধারণ সমান্তরাল আঁকা যেতে পারে।

যেমনটা তুমি জানো, একটি সমতল ত্রিভুজে (আগের পৃষ্ঠার ছবির বাঁ দিকে) A, B এবং C বাহুর সমষ্টি ২ সমকোণের সমান এখন কল্পনা করা যাক, পৃথিবীপৃষ্ঠে একটি ত্রিভুজ আঁকা হলো (ডানদিকের ছবিতে)। এ ত্রিভুজের কোণগুলোর সমষ্টি পৃথিবীর গোলাকৃতির জন্য দুই সমকোণের চেয়ে বড় হবে। এ পার্থক্য শুধু তখনই লক্ষণীয় হবে, যখন ত্রিভুজটির আকৃতি পৃথিবীর ত্রিভুজের সঙ্গে তুলনীয় হবে।

আমরা অল্প গতির আলোচনায় গতিবেগ যোগফলের সাধারণ নিয়ম ব্যবহার করতে পারি। ঠিক যেভাবে পৃথিবী পৃষ্ঠের ছোট এলাকা মাপতে সমতলের ওপর আঁকা জ্যামিতির নিয়ম প্রয়োগ করা সম্ভব।

ষষ্ঠ অধ্যায় | ভর

ভর

মনে করি, আমরা কিছু জড় বস্তুকে একটি নির্দিষ্ট গতিতে চালাতে চাই। আমাদের একটি নির্দিষ্ট বল এতে প্রয়োগ করতে হবে। ফলে বস্তুটি গতি অর্জন করবে এবং ঘর্ষণের মতো বাইরের শক্তির অনুপস্থিতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বেগ প্রাপ্ত হওয়ার অভিপ্রায়ে ত্বরণায়িত হতে পারে। আমরা দেখবো যে নির্দিষ্ট বেগ প্রাপ্তির জন্য প্রদত্ত বলের সাহায্যে বিভিন্ন বস্তুকে ত্বরণায়িত করতে বিভিন্ন সময় বিরতি প্রয়োজন

ঘর্ষণের বলকে অগ্রাহ্য করে কল্পনা করি, কোন স্থানে একই মাপের দুটি গোলক নেই-একটি সিসার, অন্যটি কাঠের তৈরি। তাদের প্রত্যেকের ওপর একই বল প্রয়োগ করি, যে পর্যন্ত না তাদের গতি ঘন্টায় ১০ কিলোমিটার বৃদ্ধি পায়।

দৃশ্যত কাঠের গোলকের চেয়ে আমাদের সিসার গোলকের ওপরে বল (Force) বেশি সময় ধরে প্রয়োগ করতে হবে; কাঠের গোলকের চেয়ে সিসার গোলকের ভর বেশি। যেহেতু অপরিবর্তনীয় বলের প্রভাবাধীনে, সময়ের সঙ্গে গতিবেগ সমানুপাতিক হারে বাড়ে একটি জড়বস্তুকে অভিষ্ট গতিবেগে পৌঁছে দিতে পর্যাপ্ত সময় পর্যন্ত ত্বরণায়িত করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয় সময়ের সঙ্গে ভর সম্পর্কযুক্ত এই সম্পর্কের সঙ্গে ভর সমানুপাতিক, ত্বরণ সৃষ্টিকারী বলের উপর নির্ভরশীল হওয়া সহগ। অর্থাৎ

$$F = \frac{d}{dt}(mv) = \frac{d}{dt}\frac{m_0 v}{\sqrt{(1-v^2/c^2)}}$$

ভর বৃদ্ধি

কোনো বস্তুর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলোর অন্যতম হল ভর আমরা সবসময় স্থির বস্তুর ভরে অভ্যস্ত এটি বেগের উপর নির্ভরশীল নয় · আমাদের প্রথম দিকের বক্তব্য অনুসারে, অপরিবর্তনীয় বলের ক্রমাগত ব্যবহারে গতিবেগ বৃদ্ধি সরাসরি এর প্রয়োগ সময়ের সমানুপাতিক।

এ বক্তব্য গতিবেগ যোগের নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। পূর্বের আলোচনাগুলোয় আমরা প্রমাণ করেছি, এ তত্ত্ব সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না।

ধরি, দুই সেকেন্ড বল প্রয়োগের পর যথাযথ গতি অর্জনের জন্য আমাদের কী করতে হচ্ছে? আমরা গতিবেগ যোগের সাধারণ নিয়ম মেনে চলছি এবং প্রথম সেকেন্ড শেষে বস্তুর গতি যোগ করি, পরবর্তী সময়ে কতটুকু গতি এটি অর্জন করেছিল তার সঙ্গে।

আলোর গতির কাছাকাছি না হওয়ার আগ পর্যন্ত আমরা এমনটি করতে পারি। কিন্তু আলোর গতির কাছাকাছি ক্ষেত্রে পুরনো নিয়ম অপর্যাপ্ত হয়ে যাবে · আপেক্ষিক তত্ত্বের হিসাব অনুসারে গতিবেগ যোগের পুরনো নিয়ম ব্যবহারে যা পেতাম তার চেয়ে আমরা কিছুটা কম পাব। তার মানে উচ্চ গতিবেগ বলের প্রয়োগকালীন সময়ের আনুপাতিক হারে বাড়বে না; বরং কিছুটা ধীরগতিতে বাড়বে · এটি শুধু প্রাকৃতিক, কারণ এখানে সীমিত গতিবেগ বিরাজমান।

প্রদত্ত অপরিবর্তনীয় বল দিয়ে বস্তুর গতিবেগ আলোর নিকটবর্তী হওয়ার সাথে সাথে গতিবৃদ্ধি ধীর থেকে ধীরতর হতে থাকে, যাতে সীমিত গতিবেগ কখনই অতিক্রম করতে না পারে।

ভর ওই বস্তুর গতিবেগের সঙ্গে ততক্ষণই স্বাধীন বলে গণ্য হতে পারে, যতক্ষণ, বস্তুর গতিবেগ বল প্রয়োগের সময় বৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের কাছে আসলেই সময় ও গতিবেগের মধ্যকার অনুপাত থাকে না এবং ভর গতিবেগের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যেহেতু সময়ের বৃদ্ধি অসীমভাবে হয় আর গতিবেগ চরম সীমানার বেশি হতে পারে না। আমরা দেখি যে, ভর গতিবেগের সঙ্গে বাড়ে, অর্থাৎ এটি অসীম হয় যখন বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগে পৌঁছে যায়।

হিসাব-নিকাশে দেখা যায় যে, দৈর্ঘ্য কমলে একটি চলন্ত বস্তুর ভর বাড়ে। প্রকৃতপক্ষে চলমান বস্তুর ভর ও গতির দিক বরাবরদৈর্ঘ্য পরস্পর বিপরীতানুপাতিক অর্থাৎ বেগ যাইহোক না কেন এদের গুণফল অপরিবর্তনীয় . এভাবে সেকেন্ডে ২ লক্ষ ৪০ হাজার কিলোমিটার বেগে চলা আইনস্টাইন ট্রেনের ভর একটি স্থির ট্রেনের চেয়ে ১০/৬ গুণ বেশি।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে আলোর গতির সাপেক্ষে প্রচলিত গতিবেগ এত তাৎপর্যহীন যে আমরা ভর পরিবর্তনে অগ্রাহ্য করতে পারি, ঠিক যেভাবে একটি বস্তুর ভর ও গতির মাঝে যোগসূত্রকে অগ্রাহ্য করি অথবা ওই গতিবেগগুলো যেগুলোতে দুটি ঘটনার পর্যবেক্ষকরাও ঘুরে আসেন তাদের মধ্যকার সময় বিরতির নির্ভরতাকেও আগ্রাহ্য করে

দ্রুত গতির ইলেক্ট্রন প্রত্যক্ষের মাধ্যমে আমরা ভর এবং বেগের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণ করতে পারি যার উৎপত্তি আপেক্ষিক তত্ত্ব থেকে।

ল্যাবরেটরির আধুনিক পরীক্ষামূলক যন্ত্রে একটি ইলেক্ট্রনের আলোর কাছাকাছি গতিতে চলা খুবই সাধারণ ব্যাপার। বিশেষ যন্ত্রে আলোর গতির চেয়ে সেকেন্ডে মাত্র ৩০ কিলোমিটার কম বেগের লক্ষ্যে ইলেক্ট্রনকে ত্বরণায়িত করা যায়।

প্রমাণিত হয়েছে যে, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান স্থির ইলেক্ট্রনের ভরের সঙ্গে চলন্ত ইলেক্ট্রনের ভর তুলনা করতে যথেষ্ট সক্ষম। পরীক্ষা-নিরীক্ষা আপেক্ষিকতত্ত্বের একটি অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে গতিবেগের ওপর ভরের নির্ভরতার সম্পর্ককে পুরোপুরি নিশ্চিত করেছে।

এক গ্রাম আলোর মূল্য কত?

বস্তু ভরের বৃদ্ধি এর ওপর প্রয়োগ করা শক্তির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। বস্তুটিকে গতিতে স্থাপনে প্রয়োজনীয় বল এর কাজের সমানুপাত। বস্তুকে কেবল গতির মধ্যে আনতে গেলে কাজ করার প্রয়োজন নেই। সব বল বস্তুতে প্রয়োগ করা যায়, বস্তুর শক্তির যে কোনো রকম বৃদ্ধির মানে হচ্ছে এর ভরের বৃদ্ধি। তাই তাপ প্রয়োগে বস্তুর ভর বেড়ে যাওয়ার এটাই কারণ। আবার ওই একই কারণে বলা যায়, কেন একটি স্প্রিংকে চাপ প্রয়োগ করলে তার ভর বেড়ে যায়। যেহেতু বস্তুর এক গ্রাম ভর বৃদ্ধিতেও আমাদের ২ কোটি ৫০ লক্ষ কিলোওয়াটঘন্টা (kwh) শক্তি প্রয়োগ করা প্রয়োজন, ফলে ভর ও শক্তির পরিবর্তনের মধ্যকার সমানুপাতিকতার সহগ অতাৎপর্যপূর্ণ।

ওই কারণেই সাধারণ পরিস্থিতিতে বস্তুর ভরের পরিবর্তন খুবই তাৎপর্যহীন এবং তা সঠিক পরিমাপে বিভ্রান্ত করে বা বাধা দেয়। এভাবে যদি আমরা এক টন পানি তাপ দেই শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ফুটন্তবিন্দু পর্যন্ত, তাহলে এর ভর বৃদ্ধি পাবে প্রায় এক গ্রামের ৫০ লাখ ভাগের একভাগ।

যদি আমরা এক টন কয়লা একটি আবদ্ধ অগ্নিকুণ্ডে পোড়াই তাহলে দহনে যা উৎপন্ন হবে তার ভর পোড়ার আগের ভরের তুলনায় কম হবে। এর পরিমাণ খুবই সামান্য, প্রায় এক গ্রামের $\frac{১}{৩০০০}$ ভাগ কম, যা প্রকৃত কয়লা ও অক্সিজেনের চেয়ে কম হবে। পোড়ানোর প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন হওয়া তাপ হারিয়ে যাওয়া ভর সরিয়ে নিয়েছে।

এ পর্যবেক্ষণ থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানে ভরের পরিবর্তন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

এমন একটি ঘটনার প্রতিভাস নেই, যেখানে দুটো পরমাণুর নিউক্লিয় সংঘর্ষে ঘটনাটি সংঘটিত হয় এবং ফলাফল হিসেবে নতুন নিউক্লি সৃষ্টি হয়। উদাহরণস্বরূপ একটি লিথিয়াম পরমাণুর সঙ্গে হাইড্রোজেন পরমাণুর সংঘর্ষ হলে হিলিয়ামের দুটি পরমাণু তৈরি হয়। এর প্রকৃত ভরের $\frac{১}{৪০০০}$ অংশ পরিবর্তিত হয়।

আমরা ইতিমধ্যেই বলেছি যে, একটি বস্তুর ভর এক গ্রাম বাড়াতে গেলে আমাদের অবশ্যই ২ কোটি ৫০ লাখ (২৫,০০০,০০০) কিলোওয়াটঘন্টা ক্ষমতা

প্রয়োগ করতে হবে তাই এক গ্রাম লিথিয়াম এবং হাইড্রোজেনকে হিলিয়ামে পরিবর্তিত করতে হলে এর ৪০০ গুণ কম ভরের শক্তির প্রয়োজন হবে :

$$\frac{২৫,০০০,০০০}{৪০০} = ৬০,০০০ \text{ কিলোওয়াট ঘন্টা!}$$

এখন আমরা পরের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করি : প্রকৃতিতে বিরাজমান কোন বস্তু সবচেয়ে মূল্যবান (ওজনের বিচারে)? রেডিয়াম সবচেয়ে মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে। এখন পর্যন্ত বলা যায় এর এক গ্রাম প্রায় আড়াই লাখ রুবল :

তাহলে আলোর খরচ কত?

একটি বৈদ্যুতিক বাল্বে খরচ হওয়া শক্তির ঠিক ২০ ভাগের এক ভাগ আমরা আলো আকারে ফিরে পাই। তাই এক গ্রাম আলো হলো ২৫,০০০,০০০ কিলোওয়াট-ঘন্টা যতটুকু কাজ করে তার ২০ গুণের সমান অর্থাৎ ৫০ কোটি (৫০০,০০০,০০০) কিলোওয়াট-ঘন্টা যদি আমরা ধারণা করি যে, এক কিলোওয়াট ঘন্টায় ১ টাকা খরচ হয় তাহলে ৫০ কোটি কিলোওয়াট-ঘন্টায় ৫০ কোটি টাকা খরচ হবে। যেহেতু ১০০ কোপেকে এক রুবল। ফলে ৫০ লাখ (৫,০০০,০০০) রুবল যোগ করবে। দেখা যাচ্ছে যে, ১ গ্রাম রেডিয়ামের চেয়ে ১ গ্রাম আলোর দাম ২০ গুণ বেশি

সার-সংক্ষেপ

যথাযথ এবং যৌক্তিক পরীক্ষাগুলো আমাদের বাধ্য করেছে আপেক্ষিক তত্ত্বের বৈধতা স্বীকার করে নিতে। এই তত্ত্ব আমাদের চারিপার্শ্বের জগৎ সম্পর্কে সবচেয়ে চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রকাশ করে। এ বৈশিষ্ট্যগুলো প্রথম দৃষ্টিতে তড়িঘড়ি করে সিদ্ধান্ত নেওয়াকে বাধা দেয়।

আমরা দেখেছি আপেক্ষিক তত্ত্ব মূল ধারণায় সুদূর এবং যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করে। অথচ এই মূল ধারণার মধ্য দিয়ে মানুষ প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় শত শত বছর ধরে কাজ করেছে। কিন্তু বুঝতে পারেনি অসামঞ্জস্যতা কোথায়।

তাহলে কি এই বোঝাচ্ছে যে, আপেক্ষিক তত্ত্ব আবির্ভাবের বহু আগে পদার্থবিদ্যার যে উন্নতি হয়েছিল, তা পুরনো ও অব্যবহৃত জুতার মতো নিক্ষিপ্ত করতে হবে? যদি তাই হত, তবে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য কোনো আকর্ষণ থাকতো না বা ডাক পাওয়া যেত না। কিছু নতুন তত্ত্বের নিশ্চিত আবির্ভাব ঘটবে এবং পুরনোটিকে তা গুঁড়িয়ে দেবে।

কল্পনা করা যাক, কোন যাত্রী একটি সাধারণ দ্রুতগামী ট্রেনে তার ঘড়ির সময় ঠিক করে নিলেন। কারণ, আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে সময় ধীরে প্রবাহিত হয়। তাই স্বাভাবিক ভাবেই যাত্রীর ঘড়ির সময় রেলস্টেশনের ঘড়ির সময়ের চেয়ে পিছিয়ে থাকবে। কিন্তু একাজ করতে গেলে প্রত্যেকের হাসির পাত্রে পরিণত হবে সে। একটি ঝাঁকির কারণে উচ্চমাত্রার নিখুঁত ঘড়িতে সময়ের পার্থক্য হয় ঠিকই। কিন্তু সে পার্থক্যটা হবে এক সেকেন্ডের সবচেয়ে ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ, উল্লেখ না করার মতোই।

যে রসায়ন প্রকৌশলী সন্দেহ প্রকাশ করেন, গরম করার ফলে পানি ওর ভর হারিয়ে ফেলে কিনা তাঁর যে মতিভ্রম হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কী! আর বিপরীতভাবে নিউক্লিয়ার রূপান্তরে অংশগ্রহনকারী উপাদানের পরিবর্তনের কথা বলা যায়। তাদের পারমানবিক ওজনের পরিবর্তন গণ্য করা ছাড়া পরমাণু সংঘর্ষ নিয়ে কাজ করেন যেসব পদার্থবিদ, তাদের অজ্ঞতার জন্য গবেষণাগার ত্যাগ করতে বলা বাধ্যতামূলক।

নকশাবিদরা পদার্থবিদ্যার পুরনো আইন অনুসারে তাদের ইঞ্জিনগুলোর উন্নত করবে এবং তাদের উন্নয়ন বজায় রাখবে। কারণ যদি আপেক্ষিকতত্ত্ব ভিত্তিক সংশোধন উপস্থাপিত হয়, তবে এ সংশোধন তাদের যন্ত্রগুলোর কোনো চাকায় একটি জীবাণু বসার চেয়েও কম প্রভাব ফেলবে। কিন্তু উচ্চ গতির ইলেকট্রন নিয়ে গবেষণাকারী পদার্থবিদদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তাদের ভর গতিবেগের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হবে।

আপেক্ষিক তত্ত্ব তার উদ্ভবের আগের ধারণা ও চিন্তাগুলো (notion) খণ্ডন করা থেকে দূরে থাকে, বরং সেই জায়গায় ওইসব ধ্যানধারণাকে প্রসারিত করে এবং সীমানাগুলোকে এমনভাবে নির্ধারণ করে দেয়, যাতে পুরনো ধারণাগুলোকে ভুলের কোন বিপদ ডেকে না এনেই প্রয়োগ করা যেতে পারে। আপেক্ষিক তত্ত্ব জন্মের বহু আগেই পদার্থবিদদের আবিষ্কৃত প্রকৃতির আইনকে আদৌ প্রত্যাখ্যান করা হয়নি। আসলে এখন শুধু পুরনো নিয়মগুলো কোথায় প্রয়োগ করা যাবে আর কোথায় প্রয়োগ করা যাবে না অর্থাৎ প্রয়োগের ব্যাপ্তি আরো ভালোভাবে নির্ধারিত।

আপেক্ষিকতত্ত্বের ভিত্তিতে তৈরি পদার্থবিজ্ঞান আপেক্ষিকতাভিত্তিক পদার্থবিজ্ঞান নামে পরিচিত। স্কুলে পড়ানো প্রথম দিককার পদার্থবিজ্ঞান যা চিরায়ত বা নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞান বলে পরিচিত। এদের মধ্যে প্রায় ততটুকু মিল, যেমন পৃথিবীর গোলাকৃতিকে গণ্য করা উচ্চতর জিওডেসি (Geodesy) এবং গোলাকৃতিকাকে গণ্য না করা মৌলিক জিওডেসির মধ্যে পার্থক্য। উচ্চতর জিওডেসি এগিয়েছে উলম্বের আপেক্ষিকতা থেকে, আর আপেক্ষিকতা ভিত্তিক পদার্থবিজ্ঞান ব্যবহার করেছে বস্তুর মাত্রার আপেক্ষিকতা এবং দুইটি ঘটনার মধ্যে সময় বিরতির আপেক্ষিকতা। অথচ চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞানে আপেক্ষিক তত্ত্বের কোনো ধারণাই নেই।

ঠিক যেভাবে মূল জিওডেসি থেকে উচ্চতর জিওডেসি গড়ে উঠেছে, তেমনি আপেক্ষিকতার পদার্থবিজ্ঞান বেড়ে উঠেছে চিরায়ত পদার্থবিজ্ঞান থেকে।

গোলাকীয় জ্যামিতিক নিয়ম অর্থাৎ গোলক পৃষ্ঠের জ্যামিতি থেকে গোলক পৃষ্ঠের সমতলীয় জ্যামিতিতে রূপান্তর করতে পারি। এখান থেকে অসীম দৈর্ঘ্যের নিয়মে আমরা পরিবর্তন করতে পারি। পৃথিবী তখন গোলক না হয়ে একটি অশেষ সমতলে পরিণত হবে। উলম্ব বা খাড়া রেখা পরস্ব হবে এবং ত্রিভূজের তিন বাহু ঠিক দুটি সমকোণের সমান হবে। একই ধরনের পরিবর্তন আপেক্ষিকতাভিত্তিক পদার্থবিদ্যায় হতে পারে যদি আমরা ধারণা করি যে আলোর গতিবেগ অসীমভাবে বড়। অর্থাৎ আলোর বিস্তার তাৎক্ষণিক ধরনের।

বস্তুত, যদি আলোর তাৎক্ষণিকভাবে বিস্তার ঘটে, তবে যুগপৎ ধারণায় আমরা যা দেখেছি তা পরম হবে। ঘটনাগুলোর মধ্যে সময় বিরতি এবং বস্তুর মাত্রা পরম হবে, যেসব কাঠামো থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করা হবে তা বিবেচনায় না এনেই।

ফলে আমরা সব চিরায়ত ধারণাগুলোকে টিকিয়ে রাখতে পারি যদি আমরা আলোর গতিবেগকে অসীম বলে বিবেচনা করি।

তবুও আলোর সীমিত গতিবেগ এবং সময় ও স্থানের পুরনো ধারণার মধ্যে সমন্বয় ঘটানোর চেষ্টা একজন ব্যক্তিকে উদ্ভট অবস্থায় ফেলতে পারে। তিনি জানেন পৃথিবী গোল, কিন্তু দৃঢ়ভাবে বলেন, তার শহরের লম্বটি পরম। আর তাই শহরের বাইরে তিনি পা ফেলেন না এই ভয়ে যে, তিনি মহাশূন্যে ছিটকে পড়বেন।

লেভ ডেভিডোভিচ লান্ডাউ এবং ইও. রুমার

বর্তমান বইটি লেখা হয়েছে মূলত What is the Theory of Relativity অবলম্বনে এই বইটির যে দুজন লেখক তারা হচ্ছেন বিখ্যাত সোভিয়েত পদার্থবিজ্ঞানী লেভ ডেভিডোভিচ লান্ডাউ এবং পদার্থবিজ্ঞানী ইও. রুমার।

লেভ ডেভিডোভিচ লান্ডাউ (১৯০৮-১৯৬৮) : তাত্ত্বিক পদার্থবিজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে রয়েছে ডেভিডোভিচ লান্ডাউর (L. Landau) অনেক মৌলিক অবদান। স্টালিন আসলে জেল খাটতে হয়েছে লান্ডাউকে। তবে ভাগ্য ভালো বলতে হবে মাত্র এক বছর তার কারণ সম্ভবত পিওতর কাপিটজা। কেননা কিংবদন্তিতুল্য রাদারফোর্ডের সহকর্মী পিওতর কাপিটজা রাগ করে ক্রেমলিনে গিয়ে স্টালিনকে বলেছিলেন, লান্ডাউকে মুক্তি না দিলে তিনি দেশ ত্যাগ করবেন কোপেনহেগেন থেকে নীলস বোর স্টালিনকে লিখেছিলেন, 'বিজ্ঞান গবেষণায় পৃথিবী বিখ্যাত লান্ডাউ এমন কিছু করতে পারেন না যার জন্য তাকে কারারুদ্ধ করা যায়।' সেই কারণেই হয়তো লান্ডাউর মুক্তি দ্রুত হয়েছিল।

সেই সময় ব্রুনস্টাইন, ভ্যাভিলভসহ অনেক সোভিয়েত বিজ্ঞানীকে কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল মুক্তচিন্তা করার কারণে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সবচেয়ে খ্যাতমান বারজন বিজ্ঞানীর একজন বলা হয় লান্ডাউকে। লান্ডাউর জন্ম ২২ জানুয়ারি ১৯০৮। লান্ডাউ মৃত্যু বরণ করেন ১ এপ্রিল ১৯৬৮। আজারবাইজানের বাকু শহরে একটি ইহুদী পরিবারে তাঁর বাস। বাবা ছিলেন পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার। কাজ করতেন বাকু ওয়েলফিল্ডে (তেল ক্ষেত্রে)। মা ছিলেন চিকিৎসক। বাকু টেকনিক্যাল স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন লান্ডাউ শিশু প্রতিভা হিসেবে গণিতে তিনি স্বীকৃতি পান। নানা দ্বন্দ্ব ও মতের মিল না হওয়ায় একের পর এক প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হয়েছে। ১৯৩২ সালে খার্কভ বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। এখানেই তার কাজ করতে এসেছেন পল ডিরাক, বক্তৃতা দিয়েছেন নীলস বোর কাপিটজা ইনস্টিটিউট থেকেই লান্ডাউ তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজগুলো করেছিলেন লান্ডাউ অতিপরিবাহিতা তত্ত্ব, অতিপ্রবহতা, কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডিনামিকস, নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান এবং কণা পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করেছেন। হিলিয়ামের অতিপ্রবাহিতা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ হিসেবে বিবেচিত হয় এ কাজের জন্য তাকে ১৯৬২ সালে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়। কোন রকম পুরস্কার তার বেশভূষা পরিবর্তন করতে পারে নি। বুকখোলা শার্ট ও স্যান্ডেল পরে থাকতে তিনি ভালোবাসতেন। যেকোনো ব্যক্তি যেকোনো সময় তার সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করতে আসতে পারতেন। তার এক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী গিনজবার্গ বলেছিলেন যে, তার যা মেধা তা দিয়ে অনেক কাজ করতে পারতেন। লান্ডাউ উত্তর দিয়েছিলেন, 'না তা ঠিক নয়, আমার পক্ষে যা সম্ভব ছিল তাই আমি করেছি।"

ইও. রুমার (১৯০১ - ১৯৮৫)
সেই সময় ক্রনস্টাইন, ভ্যাভিলভ, লান্ডাউর মতো ইও রুমারকেও (Yu.Rumer) কারারুদ্ধ হতে হয়েছিল মুক্তচিন্তার করার কারণে। কিন্তু লান্ডাউর মতো ভাগ্য অতটা ভালো ছিল না তাঁর। ইও. রুমার স্ট্যালিনের আক্রোশের শিকার হয়ে অনেক সময় কারাগারে কাটিয়েছেন। সময়টা ছিল সম্ভবত ১৯৩৮ সালের দিকে। ইও রুমারের জন্ম ১৯০১ সালের ২৮ এপ্রিল মস্কোয়। মৃত্যু ১৯৮৫ সালের ১ ফেব্রুয়ারি।

রচনাকাল : ২০০৬ - ২০১০

তথ্যসূত্র
মূল : এল লানদাউ, ইউরি রুমার
রুশ থেকে ইংরেজি অনুবাদ : আ.জদরইনিখ, মির পাবলিশার্স, মস্কো ১৯৮১
বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা : শামসুদ্দিন আহমেদ, খালেদা ইয়াসমিন ইতি

ইংরেজি সংস্করণগুলোর প্রচ্ছদ

আপেক্ষিকতার তত্ত্ব পাল্টে দিয়েছে বিজ্ঞানচেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তি। জড়জগৎ-বিচারের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের এই নতুন বিন্যাস জীবন-বিচারের দর্শনকেও প্রভাবিত করেছে বিপুলভাবে। আইনস্টাইন প্রদত্ত আপেক্ষিক তত্ত্বের রয়েছে জটিল জটাজাল, তবে সেইসব জটিলতা সবার বোধগম্যভাবে তাঁরাই ব্যাখ্যা করতে পারেন যাঁরা আপেক্ষিকতা বিষয়ে গভীর উপলব্ধি বহন করেন। লেভ লান্ডাউ, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রুশ পদার্থবিদ, তেমনি এক বিরল ব্যক্তিত্ব এবং পদার্থবিজ্ঞানী ইউ. রুমার-এর সহযোগে আপেক্ষিকতার তত্ত্বের তিনি যে সর্বজনবোধ্য ব্যাখ্যামূলক ভাষ্য রচনা করেছেন তা হয়ে আছে এতদ্বিষয়ে অতুলনীয় গ্রন্থ। বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী সকলের জন্য এ এক আনন্দময় পাঠ, লেখার সঙ্গে ছবি মিলিয়ে মূল রুশ সংস্করণ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং অনূদিত হয়েছে আরো নানা ভাষায়। আদি সেই গ্রন্থ অবলম্বনে বিজ্ঞান-বক্তা ও সুলেখক আসিফ এবং নুসরাত জাহানের প্রচেষ্টায় প্রাঞ্জল বাংলায় রূপান্তরিত বর্তমান সংস্করণ আমাদের পাঠকদের কাছে যেমন বিবেচিত হবে আপেক্ষিকতায় প্রবেশিকা হিসেবে, তেমনি হয়ে উঠবে স্মরণীয় পাঠ-অভিজ্ঞতা। ছোট এই বই বড় প্রভাব ফেলবে নিঃসন্দেহে, আমাদের বিজ্ঞান-চিন্তায় এবং জীবন-ভাবনায়।